মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

বিয়ের মতো অনবদ্য একটি আশীর্বাদ দুঃসহ অভিশাপে পরিণত হতে পারে যদি বিয়ের আগের ও পরের কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করা না হয়। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সাজানো দাম্পত্য জীবন শুধু স্বামী-স্ত্রীর উপরই নয় বরং গোটা সমাজের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বয়ে আনে। বিয়েকে পার্থিব জীবনের সুখ ও পরিপূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলো এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে। একজন আন্তরিক পাঠক বইটি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হবেন, ইন-শা আল্লাহ।

ISBN 9789843368805

www.seanpublication.com
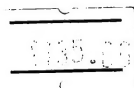
বইটির লেখক-প্রকাশক, কারোরই আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়। বরং বইটিকে আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই বইটির মূল সংস্করণ নিজের জন্য সংগ্রহ করুন এবং প্রিয়জনদের উপহার দিন।

বইটি কিনতে নিচের লিঙ্কগুলোতে ভিজিট করতে পারেনঃ

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু

বিয়ে : স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর

ভাষান্তর — আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
সম্পাদনা — আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক, সানজিদা শারমীন
শার'ই সম্পাদনা — ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
পৃষ্ঠা সজ্জা — মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

বিয়ে : স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

বিয়ে : স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ

প্রথম বাংলা সংস্করণ
শা'বান ১৪৩৪। জুলাই ২০১৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ
রাবিউস্-সানি ১৪৩৫। ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তৃতীয় মুদ্রণ
শা'বান ১৪৩৭। মে ২০১৬

চতুর্থ মুদ্রণ
রাবিউল-আউয়াল ১৪৩৯। ডিসেম্বর ২০১৭

পঞ্চম মুদ্রণ
রমাদান ১৪৩৯। মে ২০১৮

ISBN Paperback: 978-984-33-7587-2
www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
দোকান নং ৩, দ্বিতীয় তলা
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
+88 01753 344 811

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী‘আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী‘আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তাঁর এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> « কোন মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশীমনে প্রদান না করলে কারো জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। » [সাহীহ আল-জামি’ আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী‘আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> “...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।”
>
> [সূরাহ আল-বাকারাহ, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী‘আতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী‘আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

> “...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” [সূরাহ আল-মা’ইদাহ, ৫:৮৭]

সূচি

প্রকাশকের কথা

ড. জর্জ মুরাদ ছিলেন আমাদের ইউনিভার্সিটির বায়োলজিকাল ফ্যাকাল্টির ডিন। আমরা যারা টিচিং অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম তাদের তিনি প্রথম দিনই বলে দিলেন, You can choose your wife but not co-workers. If you don't like your wife, you can leave her. But you'll starve if you leave your job as you don't like your co-worker. So, adjust yourselves with the office environment.

মোদ্দা কথা, স্ত্রীর সাথে না বনলে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চাকরি গেলে মানুষ খাবে কী? বিয়েতে না-হয় মেয়ে পছন্দ করা যায়, কিন্তু আমার সাথে কারা কাজ করবে তাতে তো আমার কোনো হাত নেই। সুতরাং চাকরিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে, সবাইকে সমঝে চলতে হবে।

পশ্চিমকে যতটা দেখেছি, তাদের অধুনা দর্শনে পরিবারকে পেছনে ফেলে কর্মক্ষেত্র এগিয়ে চলছে। পরিণতি? তাদের সমাজে ভাঙনের খ্যানখ্যানে বাজনাটা খুব স্পষ্টই শোনা যায়; কান পাতাও লাগে না। আমাদের বর্তমান সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার ভারী কদর এখন। তো সে সভ্যতা একা আসেনি। আপন মানুষদের নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা বাড়ছে—মানুষের হৃদয়ে তা পাথরের মতো চেপে বসছে। বাড়ছে অর্থহীন বিবাহবিচ্ছেদ। বাবা-মা'র কোন্দল দেখে ক্লান্ত শিশুরা শিখছে শুধুই সংঘাত। অবৈধ, অনৈতিক সব সম্পর্ক ভেঙে দিচ্ছে বৈধ, পবিত্র পারিবারিক বন্ধনগুলো। অদ্ভুত যান্ত্রিক উটের পিঠে চড়েছে স্বদেশ।

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগের জন্ম প্রাচ্যে। জীবনের বড় একটা অংশ পশ্চিমে কাটিয়েছেন। কর্পোরেট জগতের বহু ডাকাবুকোর গুরু তিনি। ইসলামের আলোয়

আলোকিত এ মানুষটি এমন এক চশমা দিয়ে দুনিয়াটাকে দেখেন যার জুঁড়ি নেই। আদর্শিক পা হড়কানো থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোকে তিনি ঝানু ব্যবসায়ীর চোখ দিয়ে দেখেন, ব্যবচ্ছেদ করেন। এরপর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান সাধেন। আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ইসলাম একটি দীন—পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর ব্যত্যয় হলে জীবনে ঝামেলা আসবেই; আর সে সমস্যার সবচেয়ে সুষ্ঠু সমাধান ইসলামই দিতে পারে। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক—পরিবারের বাঁধগুলো যে আজ ভাঙতে শুরু করেছে তা মেরামতের উদ্যোগ না নিলে ব্যক্তিগত জীবন থেকে যেমনি শান্তি হারিয়ে যাবে, ভবিষ্যত প্রজন্মও বিপদের মুখে পড়বে।

'Marriage: Making and Living of It' প্রকাশের পরে সিয়ান পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে বইটির অনুবাদ—'বিয়ে স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর' পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত। আল-হামদু লিল্লাহ। বইটি বহু পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনবে করুণাময় আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করি।

শরীফ আবু হায়াত অপু।

ভূমিকা

একটি সুস্থ-সুন্দর সমাজের ভিত্তি হলো পরিবার ব্যবস্থা, আর পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হলো একটি সুস্থ-সুন্দর দাম্পত্য জীবন। অথচ সেই পবিত্র দাম্পত্য জীবনে যেন আজ হানা দিয়েছে ভাঙনের মহামারি। পরিণতিতে সমাজ জীবনে তৈরি হয়েছে ভয়ানক দায়িত্ববোধহীনতা। এই বিপর্যয় এমন একটি অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দিচ্ছে যা মানুষকে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। ধ্বংস করছে পরিবার। ক্রমেই যেন নির্মম হয়ে উঠছে ভাঙনের এই করুণ সুর।

দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য সমস্যা সমাধানে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে বহু মানুষকে পরামর্শ দিয়েছি; আলহামদু লিল্লাহ! অনেকের জীবনেই তা বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। আমার এ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যে উপসংহারে পৌঁছেছি তা হলো দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি কেবল স্বামী-স্ত্রীর মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের উপরই নির্ভর করে। তারা যদি সত্যিই সুখী হতে চায় তাহলে কেউ তা রোধ করতে পারবে না; আর তারা যদি অশান্তি সৃষ্টি করে তাহলে কেউই তাদের শান্তি এনে দিতে পারবে না।

এই ছোট্ট বইটি দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং কীভাবে তাকে সুখী-সমৃদ্ধ করা যায় সেসব বিষয় তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমি আশা করি, এই বইটিতে দেওয়া পরামর্শ যারা মানবেন তারা সত্যিই উপকৃত হবেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হবেন। বইটি যদিও মুসলিমদের উদ্দেশেই লেখা, তবে অন্যরাও এ থেকে উপকৃত হবেন ইনশা আল্লাহ।

মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ।

ইসলামে বিয়ে...

সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গীসাথিদের প্রতি। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

“তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের পেয়ে পরিতৃপ্ত হও। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা আর-রূম, ৩০:২১]

সুপ্রিয় পাঠকগণ!

আমি নিশ্চিত যে আপনারা জানেন, ইসলামে বিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে সম্পাদিত সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে দুজন মানুষের মাঝে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে হ্যাঁ, বিয়ের সর্বোত্তম সাক্ষী হলেন আল্লাহ ﷻ; তাঁর কাছেই মূলত দায়বদ্ধ থাকেন এ চুক্তির উভয়পক্ষ। তাই নারী পুরুষ দুজনেরই ভালো করে বোঝা প্রয়োজন যে, তারা যে চুক্তিটি করতে যাচ্ছেন সেটি কেমন! কী তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কী তার তাৎপর্য!

প্রথমেই আমি কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছি। এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ‘বিয়ে’ নামক বন্ধনটির কথা আলোচনা করেছেন। এটিকে তিনি তাঁর একটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন!

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তিনটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর প্রথমটি হলো *সুকূন*।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন, এটি তাঁর একটি নিদর্শন। তিনি আপনাদের মধ্য থেকে আপনাদের জন্য জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন আপনারা তাদের সাথে *সুকূন* লাভ করতে পারেন। তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, এই *সুকূন*-এর তাৎপর্য কী?

আরবিতে *সুকূন* শব্দটি *আল-হারাকা* বা গতিশীলতার বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবি ব্যাকরণে *আল-হারাকা* একটি হরফের মাত্রার মতো। এটি নির্দেশ করে কীভাবে হরফটি গতি পাবে বা কীভাবে উচ্চারিত হবে। যখন কোনো অক্ষরের উপরে *সুকূন* পাওয়া যায় তখন অক্ষরটিকে মূল অক্ষরের মতো করেই উচ্চারণ করতে হয়, সেখানে স্থির হতে হয়।

বিয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে আল্লাহ ﷻ *সুকূন* বা প্রশান্তি লাভের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি আমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাদের সাথে *সুকূন* তথা প্রশান্তি খুঁজে পাই। তাই এই চুক্তিটির প্রথম শর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রী দুজন দুজনের সাথে প্রতিজ্ঞা করছে যে তাদের যৌথ এ জীবনধারার প্রতিটি কাজকর্ম এমন হবে যা তাদের উভয়ের জন্য হবে *সুকূন* বা প্রশান্তির উৎস। তাদের আবাস-নিবাস, তাদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা—সবকিছুই হবে পারস্পরিক প্রশান্তির উৎস।

তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করছেন যে, তারা জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূরণীয় একান্ত বিষয়গুলো আর কোথাও খুঁজবেন না। তাদের চোখ, কান ও হৃদয় জীবনসঙ্গী ছাড়া অন্য কোথাও গিয়ে দিকহারা হবে না। তারা জীবনসঙ্গীর প্রতি কোনো অবহেলা করবে না, তাকে ছেড়ে যাবে না, ফেলে যাবে না।

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আপনারা যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের সবাইকে তিনি যেন জীবনসঙ্গীর মাঝে এই প্রশান্তি দান করেন। অনেকেই হয়তো নানা রকম ভুল করে এই নির্মল পবিত্র পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে ফেলেছেন; ব্যাকুলভাবে আবার ফিরে পেতে চাইছেন হারিয়ে ফেলা সে সুখপাখিটাকে। তবে মনে রাখতে হবে, এটি ফিরে পাওয়া শুধু কারও একক চেষ্টায় সম্ভব নয়; বরং স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তাদের নিবাসটিকে একটি সুখের নীড় করে গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ দ্বিতীয় যে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি উল্লেখ করেছেন তা হলো, *আল-মাওয়াদ্দাহ*। তিনি বলেছেন, *ওয়া জা'আলা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাহ,* 'তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।' স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি শরীর ও মনের যে মুগ্ধতা, যে আকর্ষণ অনুভব করে, যে ভালোবাসা অনুভব করে এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভালোবাসা মূলত সৃষ্টি হয় সম্মান থেকে। আমরা এমন কাউকে ভালোবাসতে পারি না যাকে আমরা সম্মান করি না। তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পরস্পরের প্রতি গভীর সম্মানবোধ থাকতে হবে। পরস্পরের ভালো গুণগুলোকে যত্নের সাথে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভুলগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য বিশেষ এক আয়নার মতো। পরস্পরের ভালোমন্দ দোষগুণ সবই চোখে পড়বে, মনের উপর প্রভাব ফেলবে। কিন্তু খুঁটিনাটি সব কিছু ধরে রেখে মন খারাপ করে মুখ গোমরা করে থাকার কোনো মানে নেই। চেষ্টা করতে হবে কেবল ভালো বিষয়গুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে, আর মন্দগুলো ভুলে যেতে। যখন নতুন কোনো ছবি স্মৃতির এই আয়নার সামনে আসে তখন সে আগের ভালো ছবিগুলোর সাথে মিলিয়ে ভালোটা রেখে দেয়। আমরা যেন মানুষের ভালো গুণগুলো পাথরের উপর এবং ভুলগুলো বালুর উপর লিখি। তাহলে ভালোটির প্রভাব দীর্ঘদিন রয়ে যাবে আর মন্দটা বাতাসের প্রথম ঝাপটাতেই মুছে যাবে।

একটি সুন্দর দাম্পত্য জীবনের অন্যতম গোপন চাবিকাঠি হলো—সুন্দর স্মৃতিগুলো মনে রাখা, আর মন্দ বিষয়গুলো ভুলে যাওয়া। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অধিকাংশ মানুষই করে এর উল্টোটা। আর সে কারণে এটা দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভালো জিনিসগুলো নিজের আজন্ম প্রাপ্য অধিকার মনে করে সেগুলো খুব হালকা করে দেখা হয়। অন্যদিকে ভুলগুলোকে পূর্বপরিকল্পিত অপরাধ হিসেবে ধরে নিয়ে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়। অথচ ইসলাম আমাদের ঠিক বিপরীতটাই শেখায়: অন্যের ভুলত্রুটি ও অপরাধগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন, কেবল একবার নয়, প্রয়োজনে ৭০বার ক্ষমা করুন।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অন্যের সবচাইতে ভালো বন্ধু হওয়া। বিয়ে এমন এক চুক্তি যেখানে স্বামী ও স্ত্রী প্রথম দিন থেকেই একে অপরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হওয়ার চুক্তিতে সই করে। যতটুকু আন্তরিকতার সাথে এ বন্ধুত্বের যত্ন নেওয়া

হবে ততটুকুই বিনিময় পাওয়া যাবে। এটা কোনো জাদু বা স্বয়ংক্রিয় বিষয় নয়। এই গভীর বন্ধুত্ব আপনা-আপনি হয়ে যায় না, একে আন্তরিকতার পরশ বুলিয়ে নিবিড় যত্নের সাথে একটু একটু করে গড়ে তুলতে হয়। যত্নের এ বিনিয়োগ যেমন হবে, বিনিময়ও তেমনই পাওয়া যাবে।

জীবনসঙ্গীকে সময় দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকে বঞ্চিত করে বন্ধুদের সাথে অকারণ আড্ডাবাজিতে সময় নষ্ট করা মোটেই উচিত নয়। এমন কিছু বিষয় তৈরি করে নেওয়া দরকার যা উভয়েরই পছন্দের। একে অন্যের কাজের মাঝে আনন্দ পাওয়ার বিষয়টা শিখে নেওয়া উচিত। সবধরনের ভালো কাজেই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। কোনো বিষয় আপনার পছন্দ না হলে আপনি আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন। তবে তা অবশ্যই হতে হবে একান্তে; আগ্রহ ও যত্নের সাথে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলা ঠিক নয়। এ সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। আবেগ অনুভূতির বিষয়ে একে অন্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

দুজনে মিলে একটি ভাষা তৈরি করে নিতে পারলে তো খুবই ভালো। এ ভাষা হবে চোখের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, ইশারা-ইঙ্গিতের সমন্বয়ে তৈরি একান্ত নিজস্ব একটি ভাষা। সময়ের পরিক্রমায় এ ভাষা যেন জাদুর মতো কাজ করে। কিছু না বলেও স্বামী বা স্ত্রী বুঝে নেয় একে অপরের মনের কথা। দীর্ঘদিনের সুখী দম্পতিদের মাঝে এমন জাদুকরী ভাষার ব্যবহার দেখতে বেশ লাগে।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত পরস্পরের উত্তম আচরণগুলোকে মনে রাখা। যখন তাদের কারও দিন খারাপ যায় এবং একটু অন্যরকম আচরণ করে তখন সেই ভালো আচরণগুলো মনে রাখলে তা তাদের সম্পর্কের অবনতি থেকে বাঁচাতে পারে। এটাই সেই ভালোবাসা, যা আল্লাহ ﷻ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থাপন করে দিয়েছেন। অন্য সকল সম্পদের মতোই এ অমূল্য সম্পদের যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে, না হলে একসময় নির্ঘাত তা হারিয়ে যাবে।

সর্বশেষ যে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি আল্লাহ ﷻ ব্যবহার করেছেন তা হলো *'রাহমাহ'* বা দয়া, মমতা। *'রাহমাহ'* হচ্ছে আল্লাহর একান্ত বিশেষ একটি গুণ। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অবারিত দয়া করেন। এমনকি কেউ তা পাওয়ার যোগ্য না হলেও তিনি

তার প্রতি দয়া করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্পর্কটিকে বর্ণনা করতে গিয়েও আল্লাহ ﷻ এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

আমরা সাধারণত তাদের প্রতি মায়া অনুভব করি যাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি খুবই দয়ার্দ্র, কিন্তু অন্য শিশুদের প্রতি হয়তো একই রকম দয়া অনুভব করি না। আবার সেই আমিই যখন আবার কোনো স্কুলের শিক্ষক হই তখন ঠিকই আমার ছাত্রদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে পড়ি। বিয়ের প্রসঙ্গে *'রাহমাহ'* শব্দটি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের দায়িত্ববোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বছরের পর বছর ধরে, জীবনের পরতে পরতে একে অন্যের প্রতি যে মায়ামমতা প্রদর্শন করা হয়, যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া হয়, *'রাহমাহ'* সে বিষয়টিকেই বোঝায়। *'রাহমাহ'* বা দয়া প্রদর্শন করা হলো গোটা জীবনকে জুড়ে থাকা এই সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো। 'প্রাপ্য অধিকার' মনে না করে পরস্পরের ভালো আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। *'রাহমাহ'* সেই গুণ যার কারণে কোনো বিনিময় না পেয়েও মানুষ অকাতরে দিয়ে যেতে পারে। একজন কোনো কারণে তার দায়িত্ব পালন করতে না পারলেও অন্যজন তার নিজ দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের প্রাপ্য অধিকার না পেয়েও ভালোবেসে যায়, শ্রদ্ধার আচরণ করে। *'রাহমাহ'* হলো বিনিময় না চেয়ে দিয়ে যাওয়া, কেননা এই দেওয়ার মাঝেই রয়েছে এক নির্মল পবিত্র আনন্দ।

কাজেই ইসলামে বিয়ে হচ্ছে দুজন নারী পুরুষের মাঝে একটি অঙ্গীকার; একে অন্যকে ভালোবাসা, সম্মান ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করার এক প্রতিশ্রুতি। সবসময় মনে রাখবেন, আল্লাহ ﷻ আমাদের সব চিন্তা, নিয়্যাত এবং কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন এই বন্ধনের প্রতি দয়া ও করুণাধারা বর্ষণ করেন। প্রতিটি দম্পতিকেই ইসলামের আদর্শ-অনুসারী হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দেন। যেদিন তারা সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে, সেদিন যেন তিনি তাদের উপরে সন্তুষ্ট থাকেন। আমি আমাদের সবার জন্য এই দু'আ করি।

বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়

আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেছেন, নাবি ﷺ বলেছেন, "চারটি জিনিস দেখে একজন নারীকে বিয়ে করা হয়: তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপসৌন্দর্য এবং দীনদারি। তোমরা বিয়ের সময় দীনদার নারীদের অগ্রাধিকার দাও।" (সাহীহ আল-বুখারি, হাদীস নং-৫০৯০)

বিয়ে করতে চাচ্ছেন এমন অনেকেই আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের প্রতি আমার পরামর্শ একই। বিয়ের জন্য যে ছয়টি বিষয় খুব দরকার সেগুলো হচ্ছে:

১. ইসলাম:

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমনটা বলেছেন, চারটি বিষয় দেখে নারীদের বিয়ে করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে দীনদারি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষদের বেলাতেও একই বিষয় প্রযোজ্য। সুতরাং প্রথমেই দেখতে হবে, আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক বিধিনিষেধগুলো পালন করে কি না। ব্যাপারটি যাচাই করার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন:

> **দীন:** সালাত, সাওম ও যাকাত ঠিকমতো আদায় করে কি না। কুরআনের জ্ঞান আছে কি না, নিদেনপক্ষে দেখে স্বচ্ছন্দে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে কি না। যেসব নারীপুরুষেরা বিয়ে করার মতো পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে, অথচ শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারে না; তাদের জন্য এটা খুবই লজ্জাজনক বিষয়!

চরিত্র: সাহস, ধৈর্য, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, ধীরস্থির স্বভাব, পুরুষের পৌরুষদীপ্ততা, নারীদের লজ্জাশীলতা, বিনয়, যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নীরবতায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, বাচাল প্রকৃতির না হওয়া ইত্যাদি।

চেহারা: মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পর্দা আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি। রুচিশীল ও বুদ্ধিমতি কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই এমন একজন পৌরুষহীন পুরুষকে বিয়ে করতে চাইবে না, যাকে দেখতে মেয়েদের মতো লাগে। বিষয়টি সত্যিই বিব্রতকর। বুড়ো বয়সে বেশিরভাগ ছেলে তার বাবার মতো আর বেশিরভাগ মেয়ে তার মায়ের মতো চেহারা পায়। তাই চেহারার বিষয়টি যদি আপনার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বাবা ও মায়ের চেহারার গঠন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কারণ, এই চেহারাটিই আপনি প্রতিদিন সকালে দেখবেন।

সতর্কতা: কোনো মানুষ যদি আল্লাহর কথাকেই গুরুত্ব না দেয়, তাহলে একসময় তারা আপনার কথাকেও পাত্তা দেবে না। জীবনের যেকোনো কঠিন মুহূর্তে আল্লাহভীতিই আপনার সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে; বরং বলা যেতে পারে, আল্লাহভীতি না থাকাটাই একটা বিপদ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ। কেননা, যেকোনো বিরোধ মীমাংসায় আপনার শেষ আশ্রয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ। অতএব, আপনার জীবনসঙ্গী যদি এর প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে আপনি নির্ঘাত এক অকূল পাথারে পড়বেন।

কয়েক মাস বাদেই তাদের রূপলাবণ্য বা স্মার্টনেসের আকর্ষণ হারিয়ে যেতে শুরু করবে। তার সব সম্পদও কোনোভাবেই আপনার নয়। এই মানুষটিই আপনার সন্তানদের প্রতিপালন করবে, আর এই সন্তানেরাই আপনার জান্নাত বা জাহান্নামের কারণ হবে। সুতরাং, আপনি যদি এমন কাউকে খুঁজে বের করে থাকেন—যে তার দীনদারির ব্যাপারে সচেতন নয়, তাহলে সে দেখতে যতই দারুণ হোক না কেন আপনি ডুবেছেন! এখনি সরে আসুন, এক্ষুনি! এটা খুবই ভয়ানক একটা ব্যাপার। আর এই লেখাটাও পড়া বন্ধ করে দিন; কেননা কারও দীনদারিই যদি ঠিক না থাকে, তাহলে এই বই পড়ে সময় নষ্ট করাটাও হবে অর্থহীন।

২. প্রেমে পড়ার কথা ভুলে যান:

'পড়ে যাওয়া' কখনোই কোনো ভালো বিষয় নয়। রোমান্টিকতার ধারণা থেকে আমরা জানি, প্রেম হচ্ছে শারীরিক আকর্ষণের অন্য একটা নাম মাত্র। সচরাচর এটা খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। আপনি যেহেতু চান আপনার বিয়েটা দীর্ঘস্থায়ী হোক, সেহেতু সম্মানবোধকে বেশি গুরুত্ব দিন। এটাই পরবর্তী সময়ে সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি করবে। 'পড়ে যাওয়া' নয় বরং বেছে নিন 'তৈরি হওয়া'। এর অর্থ, এমন একটি দাম্পত্য সম্পর্ক যেখানে বিয়ের ২৫ বছর পরও যতবার আপনি আপনার সঙ্গীর দিকে তাকাবেন, ততবার নতুন করে তার প্রেমে মজবেন। ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া মানে চোখের চাহনি, ইশারা আর কিছু বিশেষ শব্দের মিশেলে তৈরি এমন এক নিজস্ব ভাষা, যে ভাষাটা কেবলই আপনাদের দুজনার।

এ ভাষাটা যেন এক জাদুর মতো। কামনা করি, যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের সবার জীবনই এমন হোক। এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীটাই যেন একটা জান্নাতে পরিণত হয়। কাজেই, সত্যিকার ভালোবাসা তৈরি হয় সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা থেকে। এমন ভালোবাসার কারণেই আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে ও আপনার সম্মান রক্ষার্থে সবসময় সচেষ্ট থাকবে, জনসমক্ষে আপনাকে কখনো ছোট করবে না, আপনার ভুলগুলোকে আড়াল করে রাখবে। দাম্পত্য জীবনে আপনার ভালো অবদানগুলোই তুলে ধরবে।

এই ভালোবাসার কারণেই জীবন চলার পথে তৈরি হওয়া কোনো সমস্যার কারণে সে আপনাকে অভিযুক্ত করবে না; বরং সমস্যার সমাধানে আন্তরিকতার সাথে আপনার পাশে থাকবে। রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য আল্লাহর সাহায্য চেয়ে কান্নাকাটি করবে। যতদিন বেঁচে থাকবেন সে কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবে না। এমনকি আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেও আপনার মাগফিরাতের জন্য সে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

৩. আচার-আচরণ:

তার দীনদারি যদি ভালো হয়, তাহলে খেয়াল করুন সে ঘরের কাজের মানুষ, বাবা-মা, ভাইবোনদের সাথে কেমন ব্যবহার করে। রেস্টুরেন্টের ওয়েটারের সাথে, ড্রাইভার এবং এদের মতো অন্যান্যদের সাথে কেমন করে কথা বলে তা খেয়াল

করুন। সে কি অন্যদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সচেতন? দয়াশীল? সহানুভূতিশীল? অন্যদের কি সে সম্মান করে? খাবার টেবিলের আচরণগুলোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সে কি 'ধন্যবাদ' বা 'জাযাকাল্লাহ' কিংবা 'সরি'বলে? সে কি হাসিমুখে থাকে, নাকি সারাক্ষণ গোমরামুখো হয়ে থাকে? তার মুখে কি হাসির আভা আছে, নাকি সারাক্ষণ বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকে? সে কি বদমেজাজি একগুঁয়ে? নাকি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা মিশুক প্রকৃতির?

সতর্কতা: আপনি হয়তো ভাবছেন, দীনদারি যদি ঠিক থাকে তাহলে চরিত্র, আচার-আচরণ তো এমনিতেই ভালো হবে। কিন্তু দীন পালনের দিক থেকে ভালো হওয়া সত্ত্বেও সবার আচার-ব্যবহার ভালো না-ও হতে পারে। অথচ আচার-ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। কেননা, এখন থেকে এই আচার-ব্যবহারই আপনার দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। কাজেই কেমন আচরণ পেতে যাচ্ছেন তা আগেই বুঝে নিন। সহমর্মিতা, সহানুভূতি, মায়ামমতা এবং রসবোধ এখন সোনার মতোই দামি। এই গুণগুলোই আপনার সংসারকে পৃথিবীর বুকে এক টুকরো জান্নাতে পরিণত করবে।

৪. কথোপকথন:

বোকা কিন্তু সব ধরনের হয়—ছেলেও হতে পারে, মেয়েও হতে পারে। এদের আজগুবি কথাবার্তা অনেক সময় আপনাকে পাগল করে ফেলবে—যদি আপনি এদের মতো না-ও হন। কারও মানসিকতা সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা লাভ করতে চাইলে তাদের সাথে কথাবার্তায় নিজে কম কথা বলুন। তাদের বলতে দিন। তার জ্ঞানের ব্যাপারে জানুন। দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা, গঠনমূলক চিন্তাভাবনা এবং কোনো পরিস্থিতির ব্যাপারে তার সামগ্রিক বিবেচনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। জিজ্ঞাসা করুন সে কী ধরনের বই পড়ে; কোন কোন বই আর লেখক তার পছন্দের। দেখুন, সে কি সমালোচনা করতে বেশি পছন্দ করে, নাকি ভুলত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে আগ্রহী? সে কি শুধু অন্যের ভুল নিয়ে কথা বলে, নাকি ভুলের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে? শুধু সমস্যা নিয়ে কথা বলে, নাকি তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে? পার্থিব বিষয় নিয়ে বেশি আলাপ করে, নাকি আখিরাত নিয়ে? যখন ধর্ম নিয়ে কথা বলে তখন কি সে অন্যের দোষ ধরতেই বেশি ব্যস্ত

থাকে, না নিজের সীমাবদ্ধতা ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ করে? সে কি নির্দিষ্ট কোনো দলের অন্ধ অনুসারী? অন্যদের সাথে মতৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ভাবে, নাকি সারাক্ষণ মতবিরোধ নিয়ে হৈচৈ করে বেড়ায়? ঐক্যের চিন্তা করে, নাকি বিভক্তির দিকে বেশি ঝোঁকে?

সতর্কতা: স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কথোপকথন একটি সুস্থ দাম্পত্যের জীবনীশক্তির মতো। এটা না থাকলে আপনার যেন কিছুই নেই। অনেক দম্পতি বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় বন্ধই করে দেন। খেয়াল রাখবেন, আপনার বেলায় যেন এমনটা না হয়। আর এজন্য জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিন এমন একজন মানুষকে, যে হবে আপনার কথা বলার সঙ্গী, যার সাথে আপনি আপনার সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ অকপটে শেয়ার করতে পারবেন। যার সাথে আপনার পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করতে পারবেন। যে আপনার অনুভূতিগুলোকে শ্রদ্ধার সাথে শুনবে; যার কাছ থেকে আপনিও কিছু শিখতে পারবেন। যার সাথে মন খুলে কথা বলা যায় না, তার সাথে কখনো একত্রে বেশিদূর এগোনো যায় না।

৫. দুজনের জীবনের কিছু অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা:

দুজনের আগ্রহের বিষয় ও জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে অভিন্ন কিছু জিনিস খুঁজে দেখুন। বিশেষ কোনো কাজ বা বিষয়ের প্রতি যদি প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহলে সেটার মধ্যেও এমন কিছু খুঁজে বের করুন, যা আপনারা উভয়ে পছন্দ করেন। জীবনের বাকি সময়টা যেহেতু আপনারা একই সাথে বসবাস করতে যাচ্ছেন, তাই আপনাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও একই রকম থাকা ভালো। নয়তো জীবনের লম্বা একটা সময় একাকী থাকতে হবে অথবা গোটা জীবন জুড়েই আপনাকে লড়াই করে যেতে হবে।

সতর্কতা: জীবনের লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকেরই সহযোগিতা প্রয়োজন। হোক সেটা পৃথিবীকে বদলে ফেলা বা সন্তানদের মানুষ করা। এ দুটো কাজ আসলে একই। আপনার এমন কাউকে প্রয়োজন—যে হবে আপনার আনন্দ-বেদনার সাথি। লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে আপনাকে বুদ্ধি দেবে, আগ্রহের সাথে আপনার কথা শুনবে। আপনার জীবনের লক্ষ্যকে গুরুত্বহীন বলে হেলাফেলা করবে না। আপনার প্রয়োজন এমন একজনকে, যার জীবনের লক্ষ্যও আপনাকে আপনার

সময়, শ্রম, আবেগ এবং চিন্তাকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করবে। দীর্ঘকালীন পরিকল্পনাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে সুখী দাম্পত্য জীবনের গোপন রহস্য। কিটি পার্টি, বয়েজ নাইটস এবং বোলিং অ্যালেতে সংসারের কোনো লাভ নেই।

৬. পরিবার:

সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর পরিবারের দিকে খেয়াল করুন। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রথা, সংস্কৃতি, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতি প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তাদের সাথে একত্রে থাকতে পারবেন কি না তা বহুলাংশে এই বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। কিছু আদর্শ ও আকীদাগত বিষয় রয়েছে, যার সাথে কোনো আপস চলে না। যেমন: কিছু পরিবার মাজার ও দরগায় পূজো করে; আবার কিছু পরিবারে এমন ভয়ংকর সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও সেখানে বসবাস করা কঠিন। যেমন: পর্দার প্রচলন, সালাত আদায় এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলো যেখানে গুরুত্বের সাথে পালন করা হয় না।

সতর্কতা: আমি জানি আপনি গোটা পরিবারকে বিয়ে করেননি। কিন্তু আমাদের মধ্যপ্রাচ্য ও উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে বৈবাহিক জীবনে পরিবারের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জীবনের বাকি সময়টা যদি স্বামী বা স্ত্রীকে সঠিক পথে রাখার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাটাতে না চান, তাহলে নিশ্চিত করুন—আপনি যে পথে আছেন পরিবারটিও সেই পথে রয়েছে কি না। একই কথা প্রযোজ্য তাদের জীবনধারা, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, যেসব বিষয়ে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও। একদম নিজের মনমতো হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে অমিল কতখানি তা খেয়াল রাখতে হবে। কেননা সেটুকু হয় আপনাকে বদলাতে হবে অথবা মানিয়ে নিতে হবে। মনে রাখবেন, পরিবর্তন সাধন সবসময়ই কষ্টকর; তাই ভিন্নতা যত কম হবে বৈবাহিক জীবনে আপনার সুখী হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

আপনি যদি যৌথ পরিবারের কাউকে বিয়ে করেন এবং আপনাকে যদি স্বামীর পরিবারের সাথে থাকতে হয় অথবা ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারের সাথে থাকতে হয় তাহলে মানিয়ে নেওয়ার মাত্রাটা অনেক বেশি হবে। আমি বলছি

না যে আপনি যৌথ পরিবারে বিয়ে করবেন না। তবে যদি বিয়ে করতেই চান, তাহলে চোখ-কান খোলা রেখে, মনটাকে অনেক বড় করে এবং চামড়া মোটা করে এরপর বিয়ে করবেন। কেননা যৌথ পরিবারে থাকতে হলে অনেক ধৈর্য ধরে চলতে হবে। নিজেকে বদলে নেওয়ার ও অন্যদের সাথে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। তা না হলে আপনি এমন এক সীমাহীন অত্যাচারের দিকে এগোচ্ছেন যা আপনার সংসার জীবনকে নষ্ট করে দেবে; আজ না হয় কাল। তবে হ্যাঁ, যৌথ পরিবারে থাকা এখন হয়তো কঠিন হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তা আপনাকে অনেক কল্যাণ এনে দিতে পারে। তাই চাইলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বর্তমানকে গ্রহণ করতে পারেন—যেন শেষ জীবনে একাকীত্বে ভুগতে না হয়; বৃদ্ধাশ্রমে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। এর পরেও যদি আপনার কাছে মনে হয় আপনি এই চাপগুলো সহ্য করতে পারবেন না, তাহলে কোনো যৌথ পরিবারে বিয়ে করবেন না।

সন্তানদের বেড়ে ওঠা সহ নানা বিষয়ে যৌথ পরিবার বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুরো পরিবারকে পাশে পাওয়া যায়। তবে একই সাথে সেখানে অন্যেরা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অযাচিত মত দেওয়ার চেষ্টা করবে, আপনার জীবনে নাক গলানোর সুযোগ পাবে। তাদের এই হস্তক্ষেপকে আপনি 'যত্ন' হিসেবে নেবেন নাকি 'যন্ত্রণা' হিসেবে—সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর। ভালোমন্দ দুটোই রয়েছে এখানে। পরিবারকে ফেলে আলাদা থাকতে চাওয়া সবসময় সম্ভব না-ও হতে পারে। সম্ভব যদি হয়ও, তাতে আপনজনদের কষ্টের দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকবে। দিনশেষে পড়ে থাকবে আহত মর্যাদাবোধ, ক্ষতবিক্ষত অনুভূতি আর চিড় ধরা সম্পর্ক। ব্যাপারটা মোটেই উপভোগ্য নয়। তাই সম্ভব হলে এমনটি না করাই উচিত।

কিছু সাবধানবাণী:

যেসব দুঃসাহসী মানুষ মনে করেন তারা অন্যদের বদলে ফেলতে পারেন, তারা মনে রাখবেন, হিদায়াহ একমাত্র আল্লাহর হাতে। আপনার হাতে যদি সমস্ত ক্ষমতা থাকত তাহলে আপনি মানুষকে পরিবর্তন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি সম্ভবত পৃথিবীর সেই ৯৯.৯% মানুষদের মতো একজন যারা মনে করে সে মানুষকে বদলাতে পারে। যে মানুষ বিয়ের আগে কাউকে দেখে বলে, 'আমি তাকে বদলে

একজন চমৎকার মানুষ বানিয়ে ফেলব', সে আসলে তার জীবনটাকে আক্ষরিক অর্থেই যেন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আপনি যদি এমন মানুষকে বিয়ে করতে চান যার পরিবর্তন প্রয়োজন, তাহলে সে কাজটি আপনি তাকেই করতে দিন। আপনি বরং তাকে তার মতোই থাকতে দিন এবং এমন কাউকে খুঁজে বের করুন যাকে দেখে আপনি মুগ্ধ হবেন; আপনিও তার মতো একজন হতে চাইবেন।

ইন্টারনেটে কারও প্রোফাইল দেখে কাউকে বিয়ে করাকে তুলনা করা যায় 'রাশিয়ান রুলেট' নামের জুয়া খেলার সাথে: যে খেলায় পিস্তলের ছয়টি চেম্বারের যেকোনো একটাতে বুলেট থাকে। সবার প্রতি আমার আন্তরিক পরামর্শ থাকবে, এমন প্রাণঘাতী জুয়া খেলা যেন এড়িয়ে চলা হয়। অনেককে ধ্বংস হতে দেখেছি আমি। জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজখবর না নিয়ে তাকে বিয়ে করতে যাবেন না। সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার এবং বিয়ের আগে মাহরামের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎ করার অনুমোদন ইসলাম আপনাকে দিয়েছে, যাতে করে বিয়ের আগে সবকিছু ভালোভাবে জেনে নিতে পারেন।

আমি এতক্ষণ যা উল্লেখ করেছি তার সবই একটি বা দুটি সাক্ষাতেই জেনে নেওয়া সম্ভব, যদি আপনি চোখ-কান খোলা রাখেন এবং জানেন যে আপনি ঠিক কী খুঁজছেন। আশা করি, আপনারা বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন।

পরিশেষে বলছি, আমরা যেন এ বিষয়গুলো ভুলে না যাই। উপরে যা যা বলেছি সেগুলো খেয়াল রেখে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, 'অন্যের মধ্যে যে জিনিসগুলো খুঁজছি, আমার মধ্যে সেগুলো কতটুকু আছে? আমি নিজে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে পেরেছি? যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমি কি তার একজন ভালো জীবনসঙ্গী হতে পারব?'

বিয়েকে গুরুত্বের সাথে নিন। সচেতন ও আন্তরিক লোকেরাই কেবল সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করতে পারে। তাই আন্তরিকভাবে গুরুত্বের সাথে বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। কেননা, আমরা যে জীবন নিয়ে কথা বলছি সেটা আপনার জীবন; হ্যাঁ, আপনারই!

বিবাহিত জীবনকে সুখী করার উপায়

আপনি এখন বিবাহিত। আসুন, দেখি বিবাহিত জীবনকে কীভাবে সুন্দর করা যায়। দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে সুন্দর করা যায় সেটা নিয়ে একজন আমাকে একবার ২০টি প্রশ্ন করেছিল। এখানে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি। আশা করি এর মধ্যে দাম্পত্য জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের আলোচনাই চলে এসেছে।

১. সুন্দর দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য কী?

সত্য বলা, যত্ন নেওয়া, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ—এই তিনটি গুণকে আমি সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলসূত্র হিসেবে গণ্য করে থাকি। খেয়াল করুন, এখানে আমি 'ভালোবাসা' শব্দটি ব্যবহার করিনি। কারণ, ভালোবাসা মূলত সৃষ্টিই হয় এই তিনটি বিষয় থেকে। প্রচলিত অর্থে যাকে ভালোবাসা বলা হয় তা নিছক শারীরিক কামনা। শুধু কারও শারীরিক সৌন্দর্য কখনো ভালোবাসার অনুপ্রেরণা হতে পারে না। সেটা হয়তো ক্ষণিকের মোহ এবং কামনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু তা সত্যিকার ভালোবাসা নয়। দীর্ঘদিন এক সাথে থাকা ও জানাশোনার মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে সে ভালোবাসাই দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমন ভালোবাসা গড়তে প্রয়োজন পরস্পরের প্রতি সততা, যত্ন ও সচেতনতা। প্রয়োজন নিজের জীবন সঙ্গীকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।

সম্মান ছাড়া কখনোই ভালোবাসা জন্ম নিতে পারে না। আপনাকে আপনার জীবনসঙ্গীকে সম্মান করতে হবে, তার গুণগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে, তাকে আপনার জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গর্ববোধ করতে হবে। এটা হৃদয়ে এমন এক ভালোবাসার প্রদীপ জ্বেলে দেয় যা সময়ের সাথে সাথে আরও উজ্জ্বল হতে থাকে। কারণ, সম্মান করার কারণগুলোও সময়ের সাথে সাথে বেড়ে যেতে থাকে।

আর শারীরিক আকর্ষণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে যায়। মানুষ এভাবেই তৈরি। বয়স বেড়ে গেলে কেউ আরও বেশি সুন্দর হয় না; বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষ আরও পরিণত হয়, জ্ঞানী হয়; আরও বেশি কোমল, শান্ত ও ধৈর্যশীল হয়; সম্মান পাওয়ার বেশি যোগ্য হয়। এসবের কারণে যে ভালোবাসা 'গড়ে ওঠে' সে ভালোবাসা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

যেমনটা অনুভূত হয়, অকপটে তেমনটা প্রকাশ করাই হচ্ছে সত্য। আর যত্ন নেওয়া মানে হলো, অন্যকে সচেতনভাবে খেয়াল করা। কেননা আপনি জানেন আপনার এবং তার মাঝে কোনো বাধার প্রাচীর নেই। সম্মান হচ্ছে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার সঙ্গী তার হৃদয়ের মণিকোঠায় আপনাকে যে বিশেষ স্থান দিয়েছে—সেই বিশ্বাসের সঠিক মূল্য দেওয়া। যে বিশেষ অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকারের প্রাপ্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। কোনো কারণেই এ বিশ্বাসের যেন অমর্যাদা করা না হয়।

২. দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার কি কোনো সূত্র আছে?

এমন কাউকে বিয়ে করুন যাকে দেখে অনুকরণ করতে ইচ্ছে হয়; যাকে শ্রদ্ধা করা যায় এবং যার কাছ থেকে ক্ষমা করা শেখা যায়। অসুখী দাম্পত্যজীবনের সূত্র হলো, এমন কাউকে বিয়ে করা যাকে আপনি বদলে ফেলতে পারবেন বলে মনে করেন। এমন ধারণা পোষণ করলে দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবেই। কারও পরিবর্তন প্রয়োজন মানে হলো, যতটা ভালো হওয়া দরকার ততটা ভালো সে নয়। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি হয়তো এটা জেনেও নেননি যে, সে আপনার পছন্দ অনুযায়ী পরিবর্তন হতে চায় কি না। পরবর্তী সময়ে নিজেকে বদলানোর ব্যাপারে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথা শুনে আপনি নিজেই হতবিহবল হয়ে পড়বেন। ফলাফল: বিবাহিত জীবনের করুণ পরিণতি।

সূত্রের দ্বিতীয় অংশটি হলো ক্ষমাশীল হওয়া। পরস্পরের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সাধারণত দাম্পত্যজীবনে যা হয়, আমরা চাই নিজের সকল ভুলত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হোক। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে আমরা অনেক উঁচুমানের ব্যবহার আশা করি ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজেরা তেমন আচরণ করতে পারি না। এমন অযৌক্তিক চিন্তা থেকে কোনো এক অজানা কারণে আমরা সরেও

আসতে চাই না। বাস্তব জীবন আসলে এভাবে হয় না। মনে রাখবেন, অন্যের কাছ থেকে যেটা আশা করছেন, সেটা নিজে আগে করছেন তো?

দুজনের জীবনের সবকিছু ভাগাভাগি করে নিন। সে যা করতে পছন্দ করে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করুন। সব বিষয়েই হস্তক্ষেপ করবেন না; বরং চেষ্টা করুন তার কাজগুলোকে আরও সুন্দর করতে।

কথোপকথন সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একই সাথে এটা দাম্পত্য জীবনের মধুরতার পরিমাপক। দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে পড়া শুরু হয় কথোপকথন হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। যখন ১০মিনিট কথা বলার পরই দুজনের কারও বলার আর কিছু থাকে না; বরং একত্রে সময় কাটানো বলতে টিভির সামনে বসে থাকা, অথবা পত্রিকা পড়ায় রূপান্তরিত হয় তখন আপনি ধরে নিতে পারেন আপনাদের দাম্পত্য সম্পর্কে রোগ ঢুকেছে।

সুখী দাম্পত্য সম্পর্কে একে অন্যের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য একটা ব্যাকুলতা থাকে। কেবল আনুষ্ঠানিকতা বা দায়িত্ব পালন নয়; এজন্যই আপনি বাইরে থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে চাইবেন যে আপনার স্ত্রী আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। আপনি বাসায় এসেই আবার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বেরিয়ে যাবেন না। কেবল অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য পরস্পরকে সময় দেবেন না; বরং আপনি সত্যিকার অর্থেই তার কাছে থাকতে, তার সান্নিধ্য পেতে ভালোবাসবেন।

৩. একটা দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে সফল করা যায়?

এক কথায় এর উত্তর হলো 'কাজ করা'। আমরা বলি, 'দাম্পত্য জীবনকে সফল করো', কিন্তু আমরা ভুলে যাই এর অনেকটা অংশ আসলে 'কাজ করা'। এর জন্য দরকার উদ্যোগ, সময় ও শক্তি। এটা কোনো বায়বীয় বিষয় নয়; আপনি আসলে কতটুকু করলেন তা পরিমাপ করা যায় এবং তার বিনিময়ে আপনি কী পেলেন তাও মূল্যায়ন করা যায়। যেমন ধরুন, আপনার স্ত্রীর জন্য নাস্তা তৈরি করা একটা কাজ, তেমনি তার কাজগুলো করে দিতে চাওয়া এবং সাহায্য করাও একটা কাজ। স্বামী ঘরে ফেরার সময়টাতে অগোছালো না থেকে একটু পরিপাটি হয়ে সেজেগুজে থাকাটাও একটা কাজ; অত্যন্ত মূল্যবান একটা কাজ। কোথাও যাওয়ার সময় একটু এগিয়ে গিয়ে বিদায় দেওয়া; কোথাও থেকে এলে একটু

এগিয়ে অভ্যর্থনা জানানোও একটি কাজ। কীভাবে কাজ করতে হবে বুঝতে পারছেন তো? মন থেকে ইচ্ছে না করলেও, কিংবা নিজের পছন্দ না হলেও শুধু 'ওর' কথা ভেবে কিছু করাটাই হলো 'কাজ'। আপনি যদি সত্যিই এগুলো করতে পারেন তাহলে বিনিময়ে সেটা আপনার জন্য এনে দেবে একরাশ ভালোবাসা আর আকাশছোঁয়া সম্মান।

আপনার স্বামী বা স্ত্রী আপনাকে সময় না দিলে অভিযোগ করবেন না। কারণ, প্রথমত এক্ষেত্রে অভিযোগ করার কাজটা দুঃখজনক এবং অবমাননাকর। দ্বিতীয়ত, আমার একটা নিয়ম হচ্ছে: কেউ যদি ভালোবেসে কোনো কাজ না করে, তাহলে নিছক কর্তব্য পালনের জন্য কাউকে কিছু করতে বলবেন না। তৃতীয়ত, সে যে অন্য কারও সঙ্গ খুঁজছে এটা আপনার জন্য একটা সতর্ক বার্তা; কাজেই নিজেকে পরীক্ষা করুন এবং সে অনুযায়ী কাজ করুন। খুঁজে দেখুন, কেন এমনটা হচ্ছে। নিজেকে শুধরে নিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ সবসময় আনন্দের বিষয়গুলোকেই খোঁজে। সুতরাং, আপনার সঙ্গ যদি আনন্দের চাইতে বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে অন্য কোথাও তা খুঁজে পেতে চাইবে।

আমি প্রায়ই বলি, 'ঝগড়াটে কাউকে বিয়ে করার চেয়ে একটি ঘোড়া কেনা ভালো; ঘোড়াটি অন্তত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে আনতে পারত।' 'ঝগড়াটে' একটা উভলিঙ্গ শব্দ; নারী বা পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আগেই যেমনটা বলেছি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক কেমন যাচ্ছে। কী করতে হবে, কী করা যাবে না—সেই নির্দেশনা দেওয়া, অভিযোগ করা, কোনো তথ্য জানানো, পরনিন্দা-পরচর্চা করা কিন্তু এই কথোপকথনের মধ্যে পড়ে না। এই কথোপকথন বলতে বোঝায়—চিন্তা-ভাবনা, আশা, স্বপ্ন, ইত্যাদি শেয়ার করা; একে অন্যের কথাগুলো মন দিয়ে শোনা, সহানুভূতি দেখানো, পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করা, হাসিকান্না ভাগাভাগি করে নেওয়া। দুজনে একসাথে বসে নীরবে কিছু সময় কাটানোও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের একটি নিদর্শন। সবসময়ই যে কথা বলতে হবে এমন নয়। সাহচর্য কথা বলেও দেওয়া যেতে পারে, আবার নীরব থেকেও দেওয়া যেতে পারে; গুণগত মানটাই হলো সাহচর্যের মূল বিষয়। ব্যাপারগুলো আপনাকে কেউ ব্যাখ্যা করে না বললেও আপনি নিজেই বুঝে নিতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখবেন, নীরবতায়

কোনো দুশ্চিন্তা বা ক্লান্তি এসে ভর করছে কি না। মূল বিষয়টি হলো, একে অন্যের কথা আন্তরিকতা ও সম্মানের সাথে মন দিয়ে শুনতে ও জানতে চাওয়া।

অনুরাগ প্রকাশে কিছু পাগলামি করুন

জীবনসঙ্গীকে ফুল অথবা পছন্দনীয় কিছু উপহার দিন। কিন্তু তা কেবল জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে নয়। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে দিন-তারিখের এসব ছকবাঁধা জিনিস আজকাল আর কাউকে যত্ন করে মনে রাখতে হয় না, যন্ত্রগুলোই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। বরং সম্ভব হলেই উপহার দিন। সবসময় যে বড় উপহার দিতে হবে এমনও নয়; বরং উপহার দেওয়ার ভাবনাটাই মূল বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে তোমরা উপহার দাও, কারণ তা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং একে অন্যকে উপহার দিন। যখন আপনি কিছু দিনের জন্য দূরে থাকেন, অথবা কদিন কাজে ডুবে থাকার কারণে মানসিকভাবে দূরত্ব সৃষ্টি হয়—তখন উপহার দারুণ কাজ করে। উপহার সুন্দর দাম্পত্য জীবনকে জুড়ে রাখে আঠার মতো। আর হ্যাঁ, উপহারটি আপনার সঙ্গীকে একান্তে দিবেন। উপহারটিকে র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে, রঙিন ফিতে দিয়ে বেঁধে, সুগন্ধী লাগিয়ে একগুচ্ছ ফুলসহ তার হাতে তুলে দিন। ঘটনাটিকে স্মরণীয়, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সৃজনশীল করুন। মনে রাখবেন, উপহারের বস্তুটি কিন্তু এখানে মুখ্য নয়, এখানে মূল হলো একটি স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া। উপহারটি এমন ব্যাগ ভরা কিছু হওয়ার দরকার নেই—যা সবার সামনে বের করে দেবেন। বরং এটা এমন কিছু হবে যা কেবল সে-ই পাবে। কোনো উপলক্ষ করে বা ঘটা করে কিছু করতে যাবেন না; বরং তাকে এমন সময় এমন কিছু দিন যা সে তখন আশা করেনি। উপহারটিই আপনার সঙ্গীর বিশেষত্ব প্রকাশ করে বলবে, 'তুমি আমার বিশেষ একজন'। একই ঘটনা ছেলেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মনে রাখবেন, ছেলেরাও কিন্তু উপহার পছন্দ করে; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়েও বেশি। তাদেরকেও উদার মন নিয়ে উপহার দিন।

একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করা

প্রবাদ আছে—যে দম্পতি একসাথে আনন্দ উপভোগ করতে পারে, তারাই দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে পারে। খেলাধূলা, বিনোদন, ঘুরতে যাওয়া, ছুটির দিন

কাটানো, পিকনিকে যাওয়া—বৈধতার সীমারেখার মধ্যে থেকে আপনার কাছে যেটাই আনন্দের বিষয় মনে হয় সেটাই করুন। এমন কিছু করুন যেটা দুজনে মিলে উপভোগ করতে পারবেন। যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোনো খেলা হয় তাহলে আপনি হেরে যাওয়ার চেষ্টা করুন, সঙ্গীকে জিতিয়ে দিন। মনে রাখবেন, এখানে হেরে যাওয়াটাই আপনার জন্য আনন্দের। সবসময় হয়তো বিষয়টিকে সমানভাবে উপভোগ নাও করতে পারেন, কিন্তু এর বিনিময়ে আপনার জীবনসঙ্গীর মুখে যে হাসি আপনি ফোটাতে পারছেন সেটাই অনেক বড় পাওয়া। এই হাসিটাই তো সব, তাই না? তাই, হাসিটা যেন সত্যিকারের হাসি হয়। মেকি হাসি এক মাইল দূর থেকেও বোঝা যায়। সবসময় কৃতিত্ব জাহির করাটা মূল কথা নয়; সংসারে তো একেবারেই নয়। এখানে আপনার 'কাজের মূল্যায়ন' নির্ভর করে আপনাদের উভয়ের সন্তোষ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। দুজনে মিলেই কাজ করতে হবে, দুজনে মিলেই সফলতা অর্জন করতে হবে। না হলে বিষয়টা হবে এমন যেন, 'অপারেশন সফল হয়েছে কিন্তু রোগী মারা গেছে'। বর্তমান যুগের এই ব্যস্ত জীবনে, আমাদের আসলে সময় হয়ে ওঠে না 'এমনিতে' কিছু করার। আমরা সবকিছুতেই 'ফলাফল' খুঁজতে থাকি। দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা মানসিকভাবে ভীষণ পীড়া দেয়। বিয়ে হলো *সুকূন*, সুখ, মানসিক শান্তি, প্রশান্তি ইত্যাদি অমূল্য সব সম্পদ অর্জনের জন্য—বস্তুগত কোনো 'ফলাফল' লাভের জন্য নয়। পরস্পরকে সময় দেওয়ার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন আরও সহজ হতে পারে।

৪. অসুখী দাম্পত্য জীবনে কীভাবে সুখ ফিরিয়ে আনা যায়?

কাজটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন, কারণ এর জন্য একটা পূর্বশর্ত আছে। আপনি যদি সেই পূর্বশর্তটা পূরণ করতে পারেন তাহলে অবশ্য বেশ সহজ। শর্তটা হচ্ছে, 'আপনি কি সত্যিই চান আপনার দাম্পত্য জীবন সুখের হোক?' কথাটি শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু আমি আমার দীর্ঘ কাউন্সেলিং জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সংসারে অশান্তির প্রধান কারণই হচ্ছে নিজেরা সত্যিকার অর্থে সুখ না চাওয়া। জীবনকে সুখময় করার ব্যাপারে তারা কেউই সচেতন ছিল না; বরং কেবল নিজেকে বা অন্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু একটা করে বুঝ দিতে চাইছিল যে 'তারা চেষ্টা করছে'। বাস্তবে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা; কেননা তারা কখনোই সত্যিকার অর্থে চেষ্টা করেনি। তারা অসমাপ্ত একটা নাটকে অভিনয় করে চলেছিল মাত্র।

আপনি যদি আন্তরিকভাবে পরিবর্তন চান তাহলে আপনার জীবনসঙ্গী যা যা পছন্দ করে তার একটা তালিকা করে ফেলুন। বিয়ের প্রথম দিকে তার কী কী গুণ আপনার যথেষ্ট পছন্দের ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে সেগুলো? আপনি তা লিখে ফেলুন। একই সাথে সমস্যার বিষয়গুলোও লিখুন। সাধারণত এটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। যখন আমরা ভালো গুণগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করি না এবং অবদানগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ হই না, তখন দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরাটাই নিয়তি। আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, 'দিনে কতবার আপনারা পরস্পরকে ধন্যবাদ জানান? দিনে ক'বার তাকে জড়িয়ে ধরেন, চুমু খান? দিনে কতবার তাকে বলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি?'

অদ্ভুত একটা বিষয় হলো, আমরা জীবনসঙ্গীর কাজকে খুব কমই মূল্যায়ন করি। অনেকেই মনে করেন, সমালোচনা না করাটাই যেন কাজের মূল্যায়ন। এমন চিন্তা একটি মারাত্মক ভুল। কারও কাজের সত্যিকার মূল্যায়ন করা মানে, সে আপনার জন্য যা করেছে তার সবকিছুর জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।' কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা একটি সুন্দর দাম্পত্য জীবনের প্রাণ। মনে রাখবেন, নিয়মিত এ কাজটা করা একটি দারুন ব্যাপার। কোনো সমস্যা হলে তা বলতে যদি আমরা দেরি না করি, তাহলে সবকিছু সুন্দরভাবে চললে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কেন কার্পণ্য করব?

৫. মনের মানুষ বলতে কি কিছু আছে?

আত্মার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, আপনাআপনি সৃষ্টি হয় না; একটু একটু করে যত্নের সাথে গড়ে তুলতে হয়। কখনো কখনো এজন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে তাদের আপনি দেখবেন যে, তারা হয়তো কোনো বিষয় নিয়ে মুচকি হেসে যাচ্ছে, কী কারণে তারা দুজন হাসছে তা কেবল তারাই বুঝতে পারে। হয়তো দেখবেন তারা এমন একটা ভাষায় কথা বলছে যা কেবল তারাই বুঝতে পারছে। তাদের কথাগুলো হয়তো অন্যদের কাছে একেবারেই সাধারণ মনে হয়, কিন্তু তা তাদের পরস্পরের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এটা যদি আপনি গড়ে তুলতে পারেন তাহলে ৩০বছর পরেও দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে প্রেমে পড়বেন বারবার। হাসির ব্যাপারটাও এমনই গুরুত্বপূর্ণ। হাসির কিছু

পেলে সেটা অন্যজনকে জানান, যেন সে-ও আনন্দ পায়। এই আনন্দ ভাগাভাগির মাঝেই এক ধরনের নির্মল আনন্দ রয়েছে।

৬. সুখী দাম্পত্য জীবনের পেছনে কী কী বিষয় ভূমিকা রাখে?

আবারও বলছি, সত্যবাদিতা, যত্নবান হওয়া এবং পারস্পরিক সম্মানবোধই হলো দাম্পত্য-সুখের মূলসূত্র। প্রতিটি কাজ এবং উদ্যোগকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। আপনি কি সত্যবাদী? জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনকে কি আপনার নিজের প্রয়োজন হিসেবে দেখেন? আপনি তার জন্য অন্তরে যে সম্মান বোধ করেন তা কি প্রকাশ করেন? আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমার দাদা-দাদির কথা। প্রত্যেক বেলায় দাদি আমার দাদাকে নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করতেন। তিনি দাদার প্লেটে নিজ হাতে খাবার তুলে দিতেন, তার পছন্দের টুকরোটা বেছে দিতেন, খেয়াল করে দেখতেন তার কী প্রয়োজন; চাওয়ার আগেই তিনি তা প্লেটে তুলে দিতেন। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে তিনি প্রতিবেলায় দাদার সাথে খেতে বসতেন। ঘরে একাধিক কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও কারও অনুমতি ছিল না দাদাকে খাবার পরিবেশনের। তারা ট্রে নিয়ে দাদির সামনে হাজির করত, দাদি সেখান থেকে তুলে দাদাকে পরিবেশন করতেন। এই কাজগুলো করার সময় যে ভালোবাসা আর আন্তরিকতার ছাপ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠত, আজ ৪০বছর পর এবং তাদের দুজনের মৃত্যুর ২৫বছর পরও আমার মনে স্পষ্ট গেঁথে আছে। দাদি কেমন করে এ কাজগুলো করতেন? কারণ তিনি এই কাজগুলো করতে পছন্দ করতেন।

দাদাও এই ভালোবাসার বিনিময় দিতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি প্রায় সব ব্যাপারেই দাদির সাথে পরামর্শ করতেন। কোথাও গেলে দাদিকে সাথে নিয়ে যেতেন। দাদির পছন্দ অনুযায়ী কাপড়চোপড় পরতেন। দাদি ছিলেন দাদার চেকবইবিহীন ব্যাংক। তিনি সে টাকাপয়সা নিয়ে কখনো প্রশ্নও করতেন না দাদিকে। এতটা বিশ্বাস এখনকার সময়ে খুব কমই দেখা যায়। দাদা কখনো দাদির সাথে গলা চড়িয়ে কথা বলেননি। সবসময় ভালোবাসার দৃষ্টি বোলাতেন। বলতে গেলে দাদী ছিলেন দাদার প্রাণ। তারা যে দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসতেন তা তাদের আচার-ব্যবহারেই ফুটে উঠত ।

দাদি আগে মারা গিয়েছিলেন। তিন মাস পর দাদাও দাদির কাছে চলে গেলেন। কিন্তু তারা তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের জন্য স্মৃতি রেখে গেলেন—কীভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হয়, জীবনসঙ্গীর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

৭. দাম্পত্য জীবনে বাবা-মা এবং শ্বশুর বাড়ির লোকদের কতটুকু জড়ানো উচিত?

একটুকুও না। কারণ, এটা সংসারে ঝামেলা ডেকে আনার অন্যতম কারণ। বাবা-মা'র উচিত তাদের নিজেদের সংসার নিয়ে মাথা ঘামানো। একবার যখন আপনার সন্তানদের বিয়ে হয়ে যায়, তখন তারা আর শিশুসন্তান থাকে না। তাদেরকে তাদের মতো থাকতে দিন। তাদের সুবিধা অসুবিধা তাদেরকেই সামাল দিতে দিন। প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে বলেই তো তাদের বিয়ে দেওয়া হয়েছে!

আমাদের সমাজের অনেক মা তাদের ছেলেদের বিয়ে দিতে আতঙ্কিত বোধ করেন। তারা মনে করেন, ছেলের বউ এলে তিনি তার গুরুত্ব হারাবেন। তাই ছেলের বউ ঘরে এলে তার সাথে এক ধরনের অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার ছেলের বউয়ের প্রতিযোগী হয়ে ওঠেন, আপনি হারলে তো হারলেনই; জিতলেও হারলেন। তাই এই পথ ছেড়ে দিন, ওদেরকে ওদের মতোই থাকতে দিন। তাদের দাম্পত্য জীবন, সাংসারিক কিংবা ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবেন না। 'তোমরা কি সুখী?'—এ ধরনের প্রশ্ন তো ভুলেও করতে যাবেন না। বাবা-মা এবং শ্বশুর-শাশুড়ি যাদের দাম্পত্য জীবনে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন এমন কোনো সংসার আমি শান্তিপূর্ণভাবে টিকে থাকতে দেখিনি।

একই সাথে নব দম্পতিদের বলছি, আপনাদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বাবা-মা'র অতি উৎসাহ দেখতে পেলে তাদের নিরুৎসাহিত করুন। বিয়ে করার যথেষ্ট বয়স যখন আপনাদের হয়েছে, সমস্যা সমাধানের বয়সও হয়েছে আপনাদের। সমস্যা হলেই যদি বাবা-মা'র কাছে দৌড়াতে হয় তাহলে ডায়পার পরে বসে থাকুন। আপনি আসলে সংসার করার জন্যই প্রস্তুত হননি এখনো। আপনার মা যদি আপনাকে ফোন করে বলেন, "যখন তুমি তাকে 'এটা' বলেছিলে তখন সে 'কী' বলেছিল?" তখন মা'কে বলুন, "সরি মা, ও আমাকে কী বলেছে সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না।" কথাটি হাসিমুখে এবং স্পষ্ট করে বলুন।

আপনাদের সমস্যা আপনারা দুজনে মিলে সমাধান করুন। আমি বলছি না যে আপনার বাবা-মা'কে আপনি অবহেলা করবেন; তবে মনে রাখবেন আপনার বিয়ের পরে আপনার জীবনসঙ্গী আপনার সবচাইতে বেশি মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রত্যেককে যার যার অবস্থানে রেখে আপনাকে আলাদা আলাদাভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। একইভাবে যখন সন্তান হবে তখন সন্তানদের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও ভাবতে হবে। আমি অনেক দম্পতিকে দেখেছি যারা সন্তানের পেছনে এত সময় ব্যয় করে যে, নিজেরাই নিজেদের কাছে যেন অচেনা হয়ে পড়ে। ফলে, একসময় একে অপরের থেকে দূরে চলে যায়। বিয়ের পর এসব নানারকম সম্পর্কের প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে রেখে সামাল দিয়ে চলতে পারাটাই মানসিক পরিপক্কতা।

এ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে প্রচলিত 'অ্যারেন্‌জ্‌ড ম্যারেজ' নিয়ে দুটো কথা বলব। বিয়ে কি আসলে 'অ্যারেন্‌জ' করা যায়? আসলে এটা হলো অধিক উপযুক্ত যুগল খুঁজে বের করার চেষ্টা বা অ্যারেঞ্জ করা। আমার মনে হয় পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থে এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। বিশেষ করে আপনি যদি যৌথ পরিবারে বাস করতে চান তাহলে এমন কাউকে বিয়ে করা ভালো যাকে পরিবারের সব সদস্য পছন্দ করবে। যার সাথে আপনার পারিবারিক দিক থেকে সামঞ্জস্যতা ও সমকক্ষতা আছে বিয়ের জন্য তাকে বেছে নেওয়াই উত্তম।

'বিয়ে মানেই মানিয়ে চলা'। যতই মানিয়ে নেওয়া যাক না কেন, কাজটা মোটেও সহজ নয়। তাই যত কম মানিয়ে নিতে হবে ততই ভালো। অনেকটা ছুটি কাটাতে যাওয়া হোটেল রুমের মতো: আপনার ঘরের সাথে রুমটার যত মিল থাকবে তত সহজে মানিয়ে নেওয়া যাবে। ভয় পাবেন না, যতই মিল থাকুক না কেন তারপরও আপনাকে কিছু না কিছু মানিয়ে চলতেই হবে। তাই সেটা যত কমিয়ে নেওয়া যায় ততই ভালো।

এত কিছুর পরও একটা অনিবার্য কথা হলো, সন্তানের মতামত না নিয়ে বাবা-মা এবং পরিবারের উচিত নয় শুধু নিজেদের মনমতো বিয়ের 'আয়োজন' করতে যাওয়া। সন্তানকে চাপ প্রয়োগ করে বিয়ে দিতে চাওয়া অত্যন্ত মূর্খতা এবং বোকামি। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে গোটা পরিবারের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে-মেয়ে উভয়ের কাছে পরস্পরের বিস্তারিত তথ্য তুলে

ধরে তাদেরকে নিজেদের মতো বাছ-বিচার করতে দিন। যদি তারা একে অপরকে পছন্দ করে এগিয়ে যায়, তাহলে তো খুবই ভালো। আর যদি তারা মনে করে এগোনো ঠিক হবে না, তাহলে আরও ভালো। শার'ঈ সীমারেখার মধ্যে থেকে পরস্পর সম্পর্কে জানতে সুযোগ করে দেওয়াটা একটা ভালো পদক্ষেপ। কেননা এতে করে আপনারা বাবা-মা'রাও দুই পরিবারের পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

তবে হ্যাঁ, দুই পরিবারের পরিবেশ যতই মিলে যাক না কেন, বর-কনের বাবা-মা যতই ছেলেবেলার বন্ধু হোক না কেন, সম্ভাব্য জুটিকে তাদের মতো করেই চিন্তা করতে দিতে হবে। তাদের দুজনেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা রয়েছে, রয়েছে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রয়েছে জীবনের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের সিদ্ধান্ত তাদেরকেই নিতে হবে। নিজেদের সিদ্ধান্তের দায়ভারও নিতে হবে নিজেদেরকেই।

জীবনের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, বাবা-মা'রা নিজেদের উদ্বেগের কারণে যদি বেশি হস্তক্ষেপ করে ফেলেন তাহলে তা গোটা বিষয়টাকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে। অতিভদ্র যেসব 'অনুগত' সন্তান সিনেমার ডায়লগের মতো বাবা-মা'কে বলে, 'তোমরা যাকে পছন্দ করবে আমি তাকেই বিয়ে করব'; এদেরকে আবার নার্সারিতে পড়ানোর জন্য ফেরত পাঠানো উচিত। কারণ, জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিপক্কতা এখনও তাদের আসেনি। এমন আনুগত্য সব সময় ভালো ফল বয়ে আনে না। হয়তো একসময় দেখবেন আপনার এই 'অনুগত' সন্তানই একদিন আপনার সামনে 'তালাকনামা' নিয়ে হাজির হয়ে বলবে, তাদের এই ধ্বংসের জন্য আপনারাই দায়ী। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, বিয়ে করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নিজ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা রাখে না, নিজের সিদ্ধান্তের দায়ভার যে নিতে পারে না, সে আসলে বিয়ে করার জন্যই প্রস্তুত নয়। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের উচিত অন্যের জীবন ধ্বংস না করে, বিয়ে করার মতো ম্যাচিউরড না হওয়া পর্যন্ত সময় নেওয়া, অপেক্ষা করা।

৮. সাংসারিক জীবনে পরস্পরকে কীভাবে ছাড় দেওয়া যায়?

বিষয়টিকে 'ছাড় দেওয়া' না বলে 'মানিয়ে নেওয়া' বলাটাই ভালো। এটা নিছক শাব্দিক অর্থগত কোনো বিষয় নয়; বরং এটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার যে, আপনি কোন শব্দ দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন। ছাড় দেওয়ার বিষয়টি অনেকটা বাধ্য হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট; আমরা বাধ্য হলে তবেই ছাড় দিই। পক্ষান্তরে, আমরা কোনো কিছুর সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা তখনই করি, যখন কাজটিকে আরও উপভোগ করতে চাই। কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো নবদম্পতিরা ভাগাভাগি করে নিতে আপত্তি করে না। যেমন: কিছু জিনিসের মালিকানা, ব্যক্তিগত সময় এবং নিজের একান্ত গোপনীয়তা ইত্যাদি। হয়তো এটা করতে কারও কোনো উপদেশও তাদেরকে দিতে হয়নি; অথবা হতে পারে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলোতে মোহমুগ্ধ থাকার কারণে এগুলো নিয়ে হয়তো তখন তারা চিন্তাও করে দেখেনি। কিছু জিনিস আছে যেগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়াটা তেমন কোনো কঠিন বিষয় নয়; কিন্তু তা যখন ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, আচার ব্যবহার ও দীর্ঘদিনের অভ্যাস-অভ্যস্ততার উপর আঘাত হানে, তখনই বোঝা যায় আসলে কে কতটা সহনশীল। 'আমি' থেকে 'আমরা' হওয়াটা একটা কঠিন ব্যাপার। ছোট ছোট বিষয় অনেক সময় এমন বিরোধ তৈরি করে, যা অনেক সময় বড় ধরনের বিবাদের জন্ম দিতে পারে।

কিছু মানুষ স্বভাবগতভাবেই পরিচ্ছন্ন এবং সুশৃঙ্খল। আবার কেউ শৃঙ্খলাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে 'আঘাত' মনে করে। কেউ আগে ঘুমায়, আগে ওঠে। কেউ দেরিতে ঘুমায়, দেরিতে ওঠে। কেউ নাস্তা করে, কেউ করে না। কেউ কেউ স্টাইলিশ এবং ফ্যাশন সচেতন, কারও আবার যেমন তেমন একটা কিছু পরলেই চলে যায়। কিছু মানুষ চমক পছন্দ করে, অনেকে হয়তো সেটা অপছন্দ করে। অনেকে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করে—হোক ভালো কি মন্দ। অনেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে সমস্যা সমাধানের অপশনগুলো খোলা রাখে। অনেকের কাছে অবসরের বিনোদন মানেই একাকী নিভৃতে বসে থাকা। কেউ-বা আবার ভালোবাসার মানুষটির সাথে একান্তে নীরবে কিছু সময় কাটানোতেই অবসরের আনন্দ খুঁজে পায়। কারও কাছে বিনোদন মানে অনেকে মিলে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানো, অনুষ্ঠানে যাওয়া, সেখানে নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া—কেউ

হয়তো এই একই কাজটাকে অপছন্দ করে। কিছু মানুষ কোনো কাজের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার শেকল দেখতে পায়, আবার কেউ হয়তো সেই একই কাজের মধ্যেই মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। সবকিছুর পার্থক্যকে যদি এভাবে আলাদা করে দেখা যেত তাহলে বেশ হতো। কিন্তু আদতে তা হয় না। আমরা বিষয়গুলোকে দেখি 'সঠিক' বা আমার পছন্দ এবং 'ভুল' বা আমার অপছন্দ হিসেবে। এ ধরনের পার্থক্য সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের মজ্জাগত এবং আমাদের সবারই কমবেশি এমনটা হয়ে থাকে।

মেয়ার্স-ব্রিগস (Myers-Briggs) থিওরি সম্পর্কে যারা শুনেছেন তারা মনমেজাজের এইসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানেন। কিন্তু এই থিওরি সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকুক বা না থাকুক আমি নিশ্চিত, আমার দেওয়া এ বর্ণনার মাঝে আপনি আপনাকে, আপনার জীবনসঙ্গীকে, আপনার পরিবার ও বন্ধুমহলের অনেক মানুষকে খুঁজে পাবেন।

বিয়ের পর আপনি হয়তো বুঝতে পারলেন যে, আপনি যাকে বিয়ে করেছেন সে আপনার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। এখন আপনি কী করবেন?

স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে, পার্থক্য ও ভিন্নতা মানেই সমস্যা। আর তাই বিয়ের আগে আমরা আমাদের ভিন্নতাগুলোকে কিছু দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি। ভিন্নতাগুলোর সাথে আমরা খাপ খাইয়ে নিই, এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখি, প্রায় সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে চলি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিয়ের পর এগুলো মাত্র দু'সপ্তাহ টেকে। এরপরই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এসব পার্থক্যগুলোর বাস্তবতা। সংসার জীবনের পার্থক্যগুলোর প্রভাব নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি। এটা বাস্তব জীবন; আপনাকে প্রতিদিন অনেকবার করে এসব ভিন্নতার মুখোমুখি হতে হবে। আপনাকে সেগুলো সামলাতে হবে; না-হলে সমস্যা অনিবার্য। মজার ব্যাপার হলো, অনেকেই এমন পার্থক্য দেখেই বিয়ে করে; কারণ, এই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য বাইরে থেকে দেখতে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। যে ব্যক্তি সবসময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তিকে স্মার্ট মনে হয়। শান্তশিষ্ট, সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তী ব্যক্তির কাছে স্বতঃস্ফূর্ত, চঞ্চল ও উদ্যমী মানুষকে মনে হয় গুমোট পরিবেশে মুক্ত বাতাসের মতো।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব ক্ষেত্রে সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয় না। যে বৈচিত্র্য একসময় তাকে মুগ্ধ করত তা-ই পরিণত হয় বিরক্তি, সম্পর্কের অবনতি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে।

তবে সৌভাগ্যজনকভাবে এরও একটা সমাধান আছে। আর সেটা হলো, পার্থক্যকে পার্থক্য হিসেবেই গ্রহণ করা এবং তা ভালো কি মন্দ সে বিষয়টা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। এরপর আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর এই ভিন্নতা নিয়ে কোনো সমালোচনা করবেন না, যদি না সেটা অনৈতিক বা অবৈধ কোনো বিষয় হয়। তাকে তার মতোই থাকতে দিন। এড়িয়ে যাওয়া শিখুন। সেইসাথে সবকিছুতেই জড়িয়ে যাওয়া, মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। প্রতিক্রিয়া না দেখানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

তবে হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ঠিক করে নিন। আদর্শিক এবং নীতিগত বিষয়ে কখনো ছাড় দেবেন না। কেন ছাড় দেবেন না, আপনার সঙ্গীকে সেটা বুঝিয়ে বলুন। আপনার জীবনসঙ্গী যদি বিচক্ষণ হয়, তাহলে তিনি আপনার সিদ্ধান্তকে সম্মান করবেন। একই সাথে যেসব বিষয় তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিয়েও ভাবুন। আপনি যদি সেসব বিষয় অনুসারে নিজেকে বদলে চলতে পারেন, তাহলে নিজেকে বদলে ফেলুন।

ইতিপূর্বে যে সচেতনতার ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তা কি মনে আছে? এটা মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, সবকিছুই আপনার পৌরুষত্ব বা নারীত্বের পরীক্ষা নয়। আপনি 'ছাড়' দিয়ে কখনো হেরে যান না, বরং আপনি অন্যের অন্তর জয় করে নেন। তাই মৌলিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে যথাসম্ভব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ভিন্ন আকীদার, ভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির এবং অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা মানে ধ্বংসের বীজ বপন করা। তবে যারা ধর্মপালন এবং দীনদারির ব্যাপারে উদাসীন তাদের কথা আলাদা। আপনি যদি দীনের ব্যাপারে সচেতন হন, তাহলে এমন কাউকে বিয়ে করুন যে আপনার মতোই সচেতন এবং দীনের ব্যাপারে আপনার মতোই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

আপনি আপনার চিন্তাভাবনা, আদর্শ-বিশ্বাস এবং আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলাপ করে নিতে পারেন; এটা খুবই ভালো। এ ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে একে অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো রকম বিচার করতে যাবেন না, ঐকমত্য বা দ্বিমত প্রকাশ করতে যাবেন না, তর্কও করবেন না। সম্মানের সাথে কথাগুলো শুনুন এবং তারপর চিন্তা করুন আপনি কী ভালোবাসেন, কী নিয়ে থাকতে পারবেন, আপনার ভেতরের কী কী পরিবর্তন আনতে পারবেন এবং কোন বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলা প্রয়োজন। বেশিরভাগ মানুষ এরকম আলাপ চলার সময়ে তাদের নিজেদের ভালো গুণগুলোকে জাহির করতে গিয়ে এমন সব কথা বলেন যার সাথে তাদের বাস্তব সত্তার কোনো মিল নেই। অভিনয় কখনো দীর্ঘদিন টিকে থাকে না এবং কোনো না কোনো সময় এই মুখোশ খুলেই যায়। তাই বিয়ে করতে চাইলে শার‘ঈ সীমারেখার মধ্যে থেকে খোলামনে সব বিষয়ে আলাপ করে নিন। এরপর সিদ্ধান্ত নিন আপনি বিয়ে করবেন কি না। কথা বলার সময়ে পরিষ্কারভাবে সবকিছু বলুন। সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন, কোন বিষয়ে আপনি অনড় থাকবেন।

কূটনৈতিকভাবে সঠিক বা বিনয়ী হওয়ার ভান করবেন না। কোনো বিষয়ে আপনার কোনো দৃঢ় অভিমত থাকলে কথোপকথন ঠিক রাখার স্বার্থে সেটাকে লুকাবেন না বা তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না। হতে পারে সেটা আপনার ধর্মীয় কিংবা পারিবারিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত কোনো বিষয়। হতে পারে সেটা মা'র সাথে একসঙ্গে থাকা, বা আপনার পোষা বিড়ালটি আপনার সাথে বিছানায় থাকবার মতো বিষয়। যা-ই হোক না কেন—এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়—বলে দিন। পরে আবিষ্কার করার চাইতে আগেভাগেই সব বলে দেওয়া অনেক বেশি ভালো এবং কম যন্ত্রণাদায়ক। আপনার কাছে যেটা 'তুচ্ছ' কোনো বিষয়, অন্যের কাছে সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তখন আপনি যদি তার মতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান তাহলে সেটা সাংসারিক জীবনে হবে বেশ বিপজ্জনক।

৯. মানুষ কখন তার বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতা বুঝতে পারে? আর কখন সেই ব্যর্থতা নিরসনের উদ্যোগ নিতে হবে?

বিয়ে আসলে পারস্পরিকভাবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে দুজন মানুষের একত্রে বাস করার একটি চুক্তি। যখন আপনি দেখতে পাবেন দুজনের কারও কোনো

উপকার হচ্ছে না; বরং একসঙ্গে থাকাটা আনন্দের চেয়ে বেশি যন্ত্রণার, তখন বুঝতে হবে বৈবাহিক জীবন সফল হচ্ছে না। তখন নিজেকে অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো করতে হবে:

* আমি কি এটা সফল করতে চাই?

* একে সফল করতে কী কী প্রয়োজন?

* আমি কি সেই প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে আগ্রহী?

যদি এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হয় হ্যাঁ-বাচক, তাহলে এক্ষুণি কাজ শুরু করুন। আর যদি না-বাচক হয় তাহলে ইতি টানার সময় হয়েছে। তবে আপনি যদি বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েও থাকেন তবুও প্রথম তিনটি শর্ত—যথা: সত্যবাদিতা, সচেতনতা এবং পারস্পরিক সম্মানবোধের কথা স্মরণ রাখবেন। নিশ্চিত করুন যে আপনি যা করছেন তা একটুও অনৈতিক নয়; বরং তা সম্পূর্ণ সততার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অপরজন যেন খারাপ কোনো অনুভূতি নিয়ে বিদায় না নেয়। বিচ্ছেদ ব্যাপারটি এমনিতেই অনেক কষ্টদায়ক। এর সঙ্গে অতিরিক্ত আর কোনো নেতিবাচকতা যোগ করা থেকে বিরত থাকুন। পরস্পরকে শ্রদ্ধা করুন। আপনি এবং আপনার দাম্পত্য-জীবন উভয়েরই এ শ্রদ্ধা প্রাপ্য। অনন্যোপায় হলে বিচ্ছেদে দোষের কিছু নেই, কিন্তু অবশ্যই সেটা করবেন পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে এবং সম্মানজনক উপায়ে।

১০. একটা সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মূল দায়িত্ব কী? স্বামী ও স্ত্রীর জন্য কি এগুলো আলাদা?

আমার মতে একজন পুরুষের মূল দায়িত্ব উপার্জন করা ও পরিবারের সদস্যদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব পালন করা। অন্যদিকে নারীর মূল দায়িত্ব হচ্ছে ঘরকে একটি সুন্দর সুখের নীড়ে পরিণত করা এবং সন্তানদের লালনপালনের দিকে খেয়াল রাখা। আমি জানি, অনেকের কাছে এটাকে সেকেলে মনে হতে পারে। আমি তাদের বলব, আধুনিক কালের এই ইয়াপপি-পাপপি সংস্কৃতির ভয়াবহ পরিণতির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, তাহলে আপনি খুব শিগগিরই মূলের দিকে ফিরে আসবেন।

মূল দায়িত্ব পালনের পর পুরুষকে বাসার কাজগুলোতেও যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে। যেমন: সন্তানদের দেখাশোনা করা, স্ত্রীকে রান্নাবান্না ও খাবার তৈরিতে সাহায্য করা, কাপড়চোপড় ধোয়া, ঘরদোর গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি। চায়ের মগ হাতে নিয়ে টিভির সামনে সোফার উপর পা গুটিয়ে অলস বসে থাকা মোটেই কাম্য নয়।

একইভাবে একজন স্ত্রী তার মূল দায়িত্বগুলো পালনের পর যদি স্বামীর কাজে সহযোগিতা করেন সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাচ্ছি।

দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়াটা খুবই ভালো একটা গুণ। সব করতে না পারেন, যে কাজটি ভালো লাগে সেটি অন্তত করুন; তবুও কাজ করুন। সংসারের কাজে কার কী ভূমিকা থাকবে, তার স্বচ্ছতা থাকা একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। কারণ, এটা যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে সেটা নিয়ে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে যা দুজনের সম্পর্কে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

স্বামী-স্ত্রীর যেকোনো একজন সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকবেন। তাদেরকে দীনের সঠিক শিক্ষা, আচার-আচরণ শেখাবেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যবোধ শিক্ষা দেবেন। দেবেন সুস্থ চিন্তা করার খোরাক। আজকের এই আধুনিক ইয়াপপি-পাপপি সংস্কৃতিতে অনেকে মনে করেন যে শিশুদের যত্ন নেওয়া মানে হলো কেবল তাদের খাওয়ানো, গোসল করানো এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা। এই ধারণাটাই সকল মন্দের মূল। শুধু খাবার, একটা বিছানা আর খেলনা প্রয়োজন আপনার পোষা কুকুর বা বিড়ালের; আপনার সন্তানের প্রয়োজন আরও অনেক কিছু, অনেক বড় কিছু।

আপনি যদি তাকে যথার্থ মানুষ হিসেবে তৈরি করতে চান—যে হবে আপনার উত্তরসূরি—তাহলে খাবার, পোশাক, আশ্রয় বা খেলনার চেয়েও তাদের অনেক বেশি প্রয়োজন আপনার হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি। এ ব্যাপারে আপনার নিবেদিতপ্রাণ হওয়া দরকার; কারণ সন্তানদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি অনেক মা-বাবাকে দেখেছি যারা জীবনের শুরুতে অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এরা অনেকে অশ্রুসিক্ত আবেগ নিয়ে বলেন, 'আমি কখনো আমার সন্তানকে আমার মতো কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে দেব না।' আমি যখন এ

ধরনের কোনো কথা শুনি, তখন আমি তাদের বলি, "কথাটা ওভাবে না বলে এভাবে বললেই তো পারেন—'আমি আমার সন্তানকে কখনো স্থিরচিত্ত, শক্ত-সমর্থ ও সাহসী হয়ে গড়ে উঠতে দেব না; সফলতা অর্জনে আমার যে সামর্থ্য আছে সেটা তাদের অর্জন করতে দেব না।' কেননা বাস্তবে আপনাদের কথার অর্থ এটাই।" এঁদের অনেকের কাছে আমার এ বক্তব্যটি একটি কঠিন আঘাত। সন্তান প্রতিপালনের বিষয়টিকে তারা এভাবে কোনোদিন ভেবেও দেখেননি।

আপনি যদি সন্তানকে আগলে ধরে জীবনের বাস্তবতা থেকে দূরে রাখতে চান, তাকে জীবনযুদ্ধে গিয়ে প্রতিযোগিতা করতে দিতে না চান; আপনি যদি না চান যে, সে আঘাতের পর আঘাত আসা সত্ত্বেও পরাজয়ের গ্লানি মুছে আরও সাহসী ও উদ্যমী হয়ে সামনে এগিয়ে যাক; আপনি যদি না চান যে, যেকোনো সংকট মোকাবেলায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হোক; বরং আপনি যদি চান যে, সে সমস্যায় পড়লেই দৌড়ে এসে আপনার কাঁধে মাথা রাখবে এবং বক্সভরা টিস্যু দিয়ে আপনি তার চোখ মুছে দেবেন, তাহলে মনে রাখবেন—আপনিই আপনার এই সন্তানটির সবচেয়ে বড় শত্রু। জীবনযুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার দিকেই আপনি নিজ হাতে তাকে ঠেলে দিচ্ছেন। আপনি নিজেই তার জীবন ধ্বংসের পাণ্ডুলিপি লিখছেন। এমনভাবে তাকে বড় করে তুলছেন যে সে জীবনে পরজীবীর মতো বেঁচে থাকবে। এভাবে সে পৃথিবীর কোথাও সম্মান পাবে না, বরং সবসময় তাকে ক্ষত-বিক্ষত আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বর্ণহীন জীবনযাপন করতে হবে। নিগৃহীত এ জীবন তার ভেতরে এক ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি করবে। আর এই ক্ষোভের প্রভাব প্রথমেই পড়ে জীবনসঙ্গীর উপর। কেননা, মানুষ তার রাগ-ক্রোধ সবচেয়ে সহজে তার জীবনসঙ্গীর উপরই ঝাড়তে পারে।

লড়াই-সংগ্রাম মানুষকে শক্তিশালী করে; বিরূপ পরিস্থিতি শেখায় জীবন-যুদ্ধে কীভাবে টিকে থাকতে হবে। নির্মমতা ও কঠোরতা শেখায় কী করে জিততে হয়। অনেক মা-বাবা এই বিষয়গুলো বোঝেন না। আর তাই চিরজীবন সন্তানের কল্যাণ কামনা করে গেলেও তারাই তাদের সন্তানের ধ্বংসের গোড়াপত্তন করে দেন।

অনেক মা-বাবা টাকাপয়সাকে যোগ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। যার কারণে অত্যন্ত ব্যয়বহুল শিক্ষার ব্যবস্থা করে তারা সন্তানকে বাস্তবতা বিবর্জিত পরিবেশে বড় করেন। সন্তানরা তখন আর শিখতে পারে না—জীবনের সত্যিকার

সমস্যাগুলোর মুখোমুখি কীভাবে হতে হয়। আদর করে তারা সন্তানদের অনেক দামি দামি খেলনা কিনে দেন। আর এর মধ্য দিয়ে সন্তানেরা মানুষকে নিছক বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করতে শেখে। তাদের মনে গেঁথে যায়, যাদের দামি দামি খেলনা রয়েছে তারাই 'সেরা' শিশু। এরকম মা-বাবারা সন্তানদের দারিদ্র, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং কোনো কিছু হারানোর বেদনা সম্পর্কে ধারণা দেন না। জীবনের কঠিন, উচ্চাভিলাষী ও বড় বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে উদ্যম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা দরকার সেগুলো থেকে তারা তাদের সন্তানদের 'রক্ষা' করেন। যেসব সাধারণ মানুষদের সাথে তাদের লেনদেন করতে হবে, সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে, সেসব সাধারণ মানুষ আর সন্তানদের মাঝে বাবা-মা'রা দেয়াল হয়ে দাঁড়ান। এ লোকগুলোই একদিন তাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে, তাদের প্রতিষ্ঠানের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। অনেক সময় তাদের প্রয়োজন হবে মানুষকে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব দেওয়ার, যত্ন নেওয়ার এবং সমর্থন যোগানোর, মানুষকে বোঝার। শুধু ভালো কাজ করা এবং দান করার জন্যই নয়; বরং ব্যবসা-বাণিজ্য ও পারিবারিক জীবনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের উন্নয়নে কাজ করার মাঝে।

সন্তানস্নেহে অন্ধ মা-বাবারা ভুলে যান যে, একদিন এই ছোট্ট নরম তুলতুলে মানব ছানাটিকেই বিশাল পৃথিবীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে হবে। আর তখন যদি সে প্রস্তুত না থাকে তাহলে অন্যদের নেতৃত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, সে নিজেই টিকে থাকতে পারবে না। মনে রাখবেন, সন্তানদের সমর্থন প্রয়োজন, পাহারা নয়। তাদের উপদেশ প্রয়োজন, কিন্তু ঠিক কী করতে হবে হুবহু তা বলে দেওয়া নয়। তাদেরকে তাদের নিজ জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, কিন্তু তা যেন মূল্যবোধ, স্বচ্ছতা ও দায়িত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে অপকারী না হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ যে কষ্টের মধ্যে আছে তার জন্য সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে, তাদের জন্য চোখে পানি আসতে হবে। বৈধতার সীমারেখার মধ্যে থেকে তাদেরকে মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দিতে হবে। তথাকথিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান, ধর্ম, বংশ ও জাতীয়তার সীমানা ছাড়িয়ে মানুষের সাথে মিশতে দিতে হবে। তাদের শেখা উচিত যে, 'গরিবেরা নীচ, সম্মানহীন'—

এই ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। একইভাবে ধনী হলেই যে সম্মানিত হবে—এমনটাও ঠিক নয়।

সন্তানদের শেখাতে হবে, সদগুণ একটা মনের ব্যপার। কেউ দেখছে বলে আমরা ভালো কাজ করি, এমনটা যেন না হয়। ভালো কাজ করার যে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, যে অবস্থানে আমরা দাঁড়িয়েছি, এটা আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ববোধ থেকেই নিয়েছি।

সন্তানদের অবশ্যই শিক্ষা ও শিক্ষকদের মর্যাদা শেখাতে হবে। যেসব সন্তানেরা শিক্ষকদের সম্মান করতে জানে না, তারা জ্ঞানের প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আজকালকার অনেক তরুণ ও অজ্ঞদের মাঝে ব্যাপকভাবে এই রোগ বাসা বেঁধেছে। কেউ চাইলে অজ্ঞ থাকতেই পারে; নিজের জীবনকে কেউ যদি নিজেই ধ্বংস করে ফেলতে চায় তাহলে কার কী বলার আছে!

আমি আসলে যেমন, তেমন কাজই করি। আর আমি যা করি, সেটাই আমি হয়ে যাই, সেটাই আমার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানদের শেখানো উচিত তারা যা করে সেটাই তাদের পরিচয় তুলে ধরে। আমাদের সম্পদ দেখে নয়; বরং আমাদের অবদান দেখেই লোকেরা আমাদের চিনবে। লোকেরা আমাদের কাজের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সম্মান করবে। কারণ, আমরা কী ছিলাম বা আমাদের কী ছিল সেজন্য মানুষ আমাদেরকে তাদের মনে জায়গা দেয় না, তাদের জন্য কী করলাম সেজন্যই তারা আমাদের মনে রাখবে। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার বিষয়টি যদি তারা শিশুকাল থেকেই শিখতে পারে, কেবল তখনই তারা ভোগবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ভোগের উপকরণগুলো বর্জনের মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারবে। অন্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্থূল ভোগবাদিতা আমাদের সবাইকেই গ্রাস করে ফেলবে, যদি আমরা এর প্রাদুর্ভাব এখনি রোধ না করি।

আপনি যদি আপনার দায়িত্ব পালন না-করতে চান, তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ করুন, দয়া করে বাচ্চা নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সমাজের জন্য একটা যন্ত্রণা জন্ম দেওয়ার চেয়ে এটা অনেক উত্তম। কারণ, তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সমাজের জন্য বোঝা হয়ে থাকবে এবং মানুষের জন্য যন্ত্রণার কারণ বৈ কিচ্ছু হবে না।

১১.দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার পেছনে মূল দায়িত্ব কার?

অন্য যেকোনো চুক্তির মতোই এই দায়িত্ব চুক্তির উভয়পক্ষ তথা স্বামী-স্ত্রী দুজনের উপরেই বর্তায়। তাই এই দায়িত্ব সম্পর্কে উভয়েরই জানা প্রয়োজন। এটা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে যা যা করা প্রয়োজন সেটা করতে সাহায্য করবে। সাংসারিক জীবনে কে কী ভূমিকা পালন করবে তা নিয়ে আলাপ করে নেওয়ার গুরুত্বের কথা আমি আগেই বলেছি। দুজনে কথা বলে ঠিক করে নিতে হবে, কেবল ধারণার উপর ভিত্তি করে বসে থাকা যাবে না। এগুলো ভুল বোঝাবুঝি এবং মনোমালিন্য সৃষ্টি করে।

সুন্দর সংসার একটা স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সত্য করতে হলে আপনাকেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

স্বামী যদি চান, মাঝেমধ্যে বাসায় দাওয়াত করে আনা বন্ধুদের জন্য আপনার স্ত্রী রান্নাবান্না করবেন—তাহলে সেটা বলে ফেলুন এবং 'মাঝেমধ্যে' বলতে কী বোঝাচ্ছেন তা-ও আলোচনা করে নিন। স্ত্রী যদি মনে করেন, বন্ধুদের বাসায় এনে খাওয়াতে হলে রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে খাওয়াতে হবে, তিনি রান্না করবেন না—তাহলে তা-ও জানিয়ে দিন। স্বামী যদি মনে করেন, আপনার স্ত্রী আপনার জন্য নাস্তা বানাবে এবং আপনার পাশে বসে খাবে—সেটা তাকে জানিয়ে দিন। স্ত্রী যদি চান, স্বামী আপনার জন্য নাস্তা প্রস্তুত করবেন—তাহলে তা-ও বলে ফেলুন। দাম্পত্য জীবনে এসব 'ছোটখাটো বিষয়গুলো' অনেক সময় বড় ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। তাই, ছোট হোক বা বড়, আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেই তা আলোচনা করে নিন।

দ্বিতীয় মূলনীতিটি হলো—সঙ্গীর প্রয়োজনের ব্যাপারে সজাগ থাকা। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিত থাকুন, যদি এ সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারেন—'নিজের বেলায় যেমনটা চান, অন্যের বেলাতেও সেটাই করা'—তাহলে আপনাদের সংসারে কোনো সমস্যা হবে না। বিয়েকে যেই ভাইরাসটি ধ্বংস করে তা হলো দুই অক্ষরের একটা শব্দ—'আমি' তথা আত্মকেন্দ্রিকতা। পেতে চাইলে আপনাকে দিতে হবে। আপনি যা পেয়েছেন তা আপনার ফসল। ভবিষ্যতে আরও ফসল পেতে হলে আপনাকে আগে বীজ বুনতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, যতটুকু বীজ বোনা হয়, ফসল কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই সংসারের

কাজ পরস্পরের জন্য মায়ামমতা, ভালোবাসা আর আনন্দ নিয়ে করুন। দেখবেন, আপনি যা চেয়েছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি পাবেন।

আপনার জীবনসঙ্গীর সহমর্মী হোন, তাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। সে যেটা পছন্দ করে সেটা বলার আগেই করে ফেলুন। তাকে খুশি করতে চেষ্টা করুন। শক্তি বা কর্তৃত্বের খেলা খেলতে যাবেন না। সংসার জীবন কোনো শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা নয়। আপনি কোনো রেসলিং করতে যাচ্ছেন না। মনে রাখবেন, প্রতিবার যখন আপনি 'জিতবেন' তখন অপরজন হেরে যাবে। পরাজয়ে কেউ আনন্দ পায় না। একটা পর্যায়ে সে যখন হেরে যাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন আর আপনার সংসার টিকবে না। এভাবে আপনার জীবনে একটা বিশাল পরাজয় আপনি নিজেই ডেকে আনবেন। দাম্পত্য জীবন যেন একটা লম্বা রিলে রেস। ব্যাটনটি স্ত্রীর হাতেও দিতে হবে, তাকে সাথে নিয়েই জিততে হবে। এ খেলায় একা জিতে যাওয়া সম্ভব নয়।

১২. ইন্টারনেটে পাত্রপাত্রী পছন্দ ও বিয়ে!

আজকের পৃথিবীতে স্বার্থপরতাকে কোনো খারাপ কাজই মনে করা হয় না। তবে কোনো খারাপ কাজের ব্যাপারে আপনার ধারণা বদলালেই খারাপ কাজটি ভালো হয়ে যায় না। কোনো ভাইরাসের প্রেমে পড়লে আপনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। যারা বিয়ে করতে চান, তাদেরকে জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন হওয়া শিখতে হবে, জীবনসঙ্গীর চাওয়া-পাওয়ার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যথায় আপনার দাম্পত্য জীবনে ধস নামবেই, আজ অথবা কাল।

আমাদের বর্তমান জীবনব্যবস্থায়, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, টুইটার পারিবারিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। নিয়ন্ত্রণহীন মুক্ত সংস্কৃতি, টিভি সিরিয়ালের সোপ অপেরাগুলোর জীবনবিবর্জিত অবাস্তব কাহিনি—সবই তৈরি করা হয়েছে সুস্থ-সুন্দর পরিবার ব্যবস্থা ও দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করার জন্য। এগুলোর মাধ্যমে এমন সব নোংরা বিষয় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যা সরাসরি দাম্পত্য জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একেবারে ধ্বংস করে দেয়। সিরিয়ালগুলোতে সাধারণত বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টাকে গৌরবের কাজ হিসেবে দেখানো হয়। পরকীয়া প্রেম, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, পরশ্রীকাতরতা,

অতিরিক্ত বিলাসিতাসহ এমন সব আচার-ব্যবহার দেখানো হয়—যা জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। যারা এসব তৈরি করেন তারা ছাড়া আর সবাই এসব সিরিয়াল দেখে ক্ষতিগ্রস্ত হন। একটা সুন্দর দাম্পত্য জীবন পেতে হয় বাস্তব জগতে বসবাস করে, কাল্পনিক অবাস্তব চিত্রের উপর ভিত্তি করে তা লাভ করা সম্ভব নয়।

১৩. সাত বছর পরে দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কুসংস্কার।

আমি বিশ্বাস করি না বাস্তবে এমন কিছু আছে। স্ত্রীকে রেখে বাইরে কোথাও সঙ্গ খোঁজা সংসারে ভাঙন সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যা চরম অশান্তির একটা বিষয়। আপনার এমন কিছু মনে হলে তা সমাধান করে ফেলুন। বাইরে তাকাবেন না। সমস্যাটা যদি ৭ বছরের বিষয়ই হয়, তাহলে প্রতি সাত বছর পর আপনি তো আরও বুড়ো হয়ে যাবেন এবং আকর্ষণ হারাবেন! তখন কোথায় যাবেন?

১৪. সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য বাচ্চাকাচ্চা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? কোনো কোনো দম্পতিদের সন্তান হয় না, অনেকে আবার সন্তান নেন না।

আমার মনে, হয় শুধু সন্তান থাকা বা না-থাকাটা দাম্পত্য জীবনে শান্তি বা অশান্তির কারণ নয়; বরং তাদের লালনপালন করার বিষয়টাই সংসারকে শান্তিময় অথবা অশান্তিময় করে। সন্তানেরা তাদের বাবা-মা'র মাঝে একটি পারস্পরিক দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে দেয়। কারণ সন্তানের প্রতি মায়া উভয়েরই আছে। নিজেদের মধ্যে যত অমিলই থাকুক না কেন, সন্তানের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত থাকে না। তবে কেবল সন্তানই যদি এ বন্ধন রক্ষার একমাত্র উপাদান হয় তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে। অন্যদিকে সন্তানেরা মা-বাবার মনোযোগ ও সময়ের অনেকটা নিয়ে নেয়; অনেকের জন্য এটা সামলানো বেশ কঠিন হতে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি সন্তান প্রতিপালনের কাজটি দুজনে মিলে ভাগ করে নেয় এবং তাদের আচার-ব্যবহার, নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের বিষয়গুলোতে আন্তরিকভাবে যত্ন নেয় তাহলে সন্তান অশান্তির কারণ নয়; বরং তাদের দাম্পত্য জীবনের একটা অমূল্য সম্পদে পরিণত হতে পারে।

১৫. জীবনসঙ্গীর কাছে নিজের গুরুত্ব ধরে রাখার জন্য কী করা যেতে পারে?

জীবনসঙ্গীর কাছে নিজের গুরুত্ব বজায় রাখতে হলে পরস্পরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করুন এবং তা নিয়মিত প্রকাশও করুন। ভালো কাজে পরস্পরের

সাথে প্রতিযোগিতা করুন। শুধু তার মুখে একটুখানি হাসির ঝলক দেখার জন্য কিছু করুন। শুধু আপনারা দুজনে বুঝবেন এমন একটি ভাষা তৈরি করুন। আমরা আমাদের রুমের টেবিলে একটা নোটবুক রেখে দিতাম। আমরা আমাদের পরস্পরের পছন্দের বিষয়গুলো, অনুভূতিগুলো, বলতে-চাওয়া কথাগুলো সেখানে লিখে রাখতাম। কথাগুলো আমরা সামনা-সামনি বলতে পারতাম না—ব্যাপারটা এমন নয়, কিন্তু অনেক সময় যে কথা মুখে বলা যায় না তা সহজে লিখে প্রকাশ করা যায়। একে অন্যকে ফুল আর চকোলেট উপহার দিন। মনে রাখবেন, পুরুষরাও কিন্তু ফুল পছন্দ করে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, আপনার সঙ্গীর সবকিছুতেই প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। হজম করতে কষ্ট হলে দশটা লম্বা দম নিন। এরপর ভুলে যান। প্রতিক্রিয়া শুধু প্রতিক্রিয়ারই জন্ম দেবে। অবশেষে সেটা চলে যাবে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

সবশেষে, একে অপরের প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় কখনো বিছানায় যাবেন না। বিছানায় যাওয়ার আগেই সব মিটমাট করে নিন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পরস্পরকে আদর সোহাগ করুন। রাতে বিছানায় কখনো ঝগড়া নয়। এটিকে একটি নিয়ম বানিয়ে ফেলুন। যদি আপনার কোনো সমস্যা থেকেই থাকে, তাহলে সকালে এর বিহিত করুন। সাধারণত সকালের আগেই আপনাআপনি এটি সমাধান হয়ে যায়।

১৬. তর্ক-বিতর্ক করা কি ভালো?

এটা আসলে নির্ভর করছে 'তর্ক-বিতর্ক' দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে তার উপর। বিতর্ক যদি হয় অন্যকে পরাজিত করার জন্য—এবং সেজন্য যা যা দরকার তার সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া—তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে খারাপ। আর বিতর্ক মানে যদি হয় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে পরস্পরের সাথে যুক্তিপ্রমাণ-নির্ভর আলোচনা করা, তাহলে তা সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। কর্তৃত্বের লড়াইকে প্লেগ রোগের মতোই এড়িয়ে চলুন। অনেক সংসারই কর্তৃত্ব নেওয়ার প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু এমন প্রতিযোগিতা বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনে।

কিছু লোক সঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তারা নিজেদের ইচ্ছা ও কামনার সামনে সঙ্গীর মাথা নোয়ানোর জন্য ধর্মীয় বিধানের

দোহাই পাড়ে এবং সঙ্গীকে জাহান্নাম ও শাস্তির ভয় দেখায়। এটা বেশি দেখা যায় পুরুষের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে যারা জীবনে তেমন কিছুই করতে না পারার কারণে হীনমন্যতায় ভোগেন, যারা নিজেরাও বোঝেন যে তারা কোনো সম্মানের যোগ্য নয়, তারাই মূলত ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়। নারীরাও যখন মনে করে যে তারা তাদের প্রাপ্য ভালোবাসা পাচ্ছেন না বা তারা স্বামীদের কাছে ততটা কাঙ্ক্ষিত নয়, তখন তারাও ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস চালায়।

'উচিত' হচ্ছে ভাষার মধ্যে সবচেয়ে অকেজো শব্দ। সবাই যদি নিজেদের উচিত কাজগুলো করত তাহলে পৃথিবী অন্যরকম হতো। ধর্মের প্রতি এমন হঠাৎ ঝোঁকের পেছনে মূল চালিকাশক্তি কী তা দুজনেরই ভেবে দেখা প্রয়োজন। কারণ এই ধরনের ধর্মানুশীলতার নামে ধর্মের অপব্যবহারের সাথে সৃষ্টিকর্তার কোনোই সম্পর্ক নেই। কর্তৃত্বের লড়াই বিভিন্ন মোড়কে হয়ে থাকে। অনেক স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ায় জেতার জন্য তাদের সন্তানদের গুটি হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেকে আবার ব্যবহার করেন স্বাস্থ্যগত সমস্যা, বেশি খাওয়া, কম কম খাওয়া, যৌথ পরিবারের বিভিন্ন নিয়মকানুন, সাংস্কৃতিক কুসংস্কার এবং আরও অনেক কিছুকে। এগুলো সবই বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ধ্বংস বয়ে আনে।

১৭. সংসার সুখী করতে টাকাপয়সা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বচ্ছলতা কিংবা অস্বচ্ছলতা উভয়টিই সাংসারিক বন্ধন দৃঢ় হওয়ার কিংবা ভাঙনের কারণ হতে পারে। মূলত পারস্পরিক সম্মান এবং সচেতনতাই আসল জিনিস। আর এগুলো হচ্ছে চরিত্র, ধর্মানুরাগ, শিক্ষা, চালচলন ও আচরণের মহত্ত্ব, আত্মবিশ্বাস, আস্থাশীলতা, সম্মান, মমতা, পরস্পরকে খুশি করার অকৃত্রিম ইচ্ছা এবং নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মহৎ গুণের ফল। এসব গুণ কখনো টাকা দিয়ে কেনা যায় না, বা এগুলো অর্জনের জন্য আমাদের টাকার প্রয়োজনও নেই। সংসার সুখী হওয়া অথবা ভেঙে যাওয়ার জন্য অর্থ নয়; বরং অন্যান্য ব্যাপারগুলোই অধিক দায়ী। আর্থিক সমস্যাও আসলে আর্থিক সমস্যা নয়, যদি আপনি বুঝে থাকেন আমি কী বলতে—বা বোঝাতে চাচ্ছি।

১৮. বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর কাজ কোনগুলো?

মিথ্যা বলা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, প্রতারণা করা, কর্তৃত্বের জন্য লড়াই করা। একে অপরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কিংবা হাস্যরসের নামে অপরকে অসম্মান করা। রসিকতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অন্যকে সঙ্গে নিয়ে হাসা, অন্যের প্রতি হাসাহাসি করা নয়। অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এবং সঙ্গীকে পাত্তা না দেওয়া। সততা ২০১৩ সালে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তেমনি ৩০১৩ সালেও—যদি ততদিন পৃথিবী টেকে—সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে অম্লান থাকবে।

১৯. সংসারে শান্তি বজায় রাখার জন্য কি ছোটখাটো মিথ্যা 'White Lie' বলা যাবে?

মিথ্যা বলা আর খুঁটিনাটি সবকিছু না বলার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন: বিয়ের আগে কোনো সম্পর্ক থেকে থাকলে সে ব্যাপারে সঙ্গীকে খুঁটিনাটি না বলা মোটেও খারাপ কিছু নয়; বরং তা বিচক্ষণতার পরিচায়ক। কারণ, আপনার জীবনসঙ্গীর তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই। সঙ্গী যত উদারমনাই হোক না কেন, এসব জেনে দাম্পত্য জীবনে কখনো কোনো উন্নতি হয় না; বরং তাতে আরও ভাঙনের বীজ বপন করা হয়।

কিন্তু মিথ্যা বলা খারাপ এবং সেটা আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি তার সবকিছুরই বিপরীতে যায়। আসলে 'White Lie' শব্দটি বর্ণবাদের দোষে দুষ্ট একটি শব্দ। এরকম আরও কিছু শব্দ হচ্ছে, 'black Sheep', 'nightmare', 'black heart' ইত্যাদি। এসবই মূলত সাদা চামড়ার ইংরেজদের ভাষা; অথচ একজন বীর পুরুষ কালোও হতে পারে। আর দেখার মতো চোখ থাকলে সাদার চেয়ে কালোর মধ্যে বেশি ঔজ্জ্বল্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিস্থিতি বিবেচনা না করে সত্য বলা বা রূঢ়ভাবে সত্য বলা—কোনোটাই উপকারী নয়। তার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো। যেমন: রুটি বা পরোটা যদি পুড়ে যায় বা খাবারে যদি লবণ ঠিকমতো না হয় অথবা অনুরূপ অপছন্দনীয় কোনো জিনিস যদি সামনে এসে যায়, তাহলে সেগুলো বলার অনেক ভদ্রোচিত উপায় আছে। তাছাড়া অন্যান্য সময় খাবার সুস্বাদু হওয়ার কথা স্মরণ করে একটু চুপ থাকার চেষ্টাও তো করা যায়! স্বামী যদি বাসায় এসেও অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সেটা বিরক্তিকর। কিন্তু আপনি যদি এক্ষেত্রে 'অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে আসবে

না'—এরকম না বলে, তাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে, তার সাথে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলেন তাহলে তা অনেক বেশি কাজে দেবে। আপনি যেভাবে বলেছেন সেটাকে ভুল কিছু বলছি না; কিন্তু অনেক সময় 'সঠিক' হওয়ার চেয়ে 'বিনয়ী' হওয়াটা বেশি ভালো। কৌশল অবলম্বন ও বিচক্ষণতা এমন দুটি মহৎ গুণ যেগুলো দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। শুধু মানুষের ভুলত্রুটি খুঁজে বেড়ানো মোটেই বিচক্ষণতার লক্ষণ নয়। মার্জনার সাথে এড়িয়ে চলুন, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। আপনার সঙ্গীর পরাজয় দেখতে চাইবেন না। অনেক সময় দেখা যায়, আপনার সঙ্গী ঠিকই তার ভুল বুঝতে পেরেছে, কেবল মুখে বলে ক্ষমা চাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে তাদের আর কিছু বলতে যাবেন না। তাদের ছেড়ে দেওয়াটাই হবে বিচক্ষণতা। মানুষের সম্মান বজায় রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অফিস ব্যবস্থাপনা, দর-কষাকষি কিংবা সাংসারিক মতানৈক্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধীপক্ষকে তার সম্মান বাঁচানোর সুযোগ দেওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে কাউকে অপদস্থ করার চেষ্টা ভবিষ্যতে সম্পর্ক ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবে। মনে রাখবেন, আপনি নিজেও একজন মানুষ; আপনারও ভুল হবে। কাজেই, এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না যাতে করে আপনার সঙ্গী আপনার আচরণের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

২০. দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে কারও সাথে পরামর্শ করলে কি সেটা কাজে দেবে?

দুজনেই যাকে শ্রদ্ধা করেন কিংবা যার কথা আপনারা দুজনেই শুনতে ইচ্ছুক এমন কারও কাছে দাম্পত্য সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। শুধু পরামর্শ করা উদ্দেশ্য হলে তা অপরিচিত কারও সাথে করাটাই ভালো; কেননা তিনি কাউকে না চেনার কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি নিরপেক্ষ, অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন। তবে পরিচিত কারও সাথে পরামর্শ করলেও সমস্যা নেই, যদি সেই পরিচিত ব্যক্তিকে আপনারা দুজনেই শ্রদ্ধা করেন, তার উপদেশ মানবেন বলে একমত হন। পরামর্শ করার আগেই ভেবে নিন—পরামর্শদাতার সাথে একমত না হলেও তার পরামর্শ শুনতে আপনারা রাজি আছেন কি না। আপনি যদি কারও সাথে এ উদ্দেশ্য নিয়ে পরামর্শ করতে যান যে, ঘটনা যা-ই হোক না কেন তাকে আপনার সাথে একমত হতেই হবে—তাহলে তার এবং

আপনার সময় অকারণ নষ্ট করবেন না। আত্মসম্মানবোধ আছে এমন কোনো সৎ মধ্যস্থতাকারী কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হবেন না। আর যদি পক্ষপাতদুষ্ট হয়েই থাকেন, তাহলে তিনি আসলে মধ্যস্থতা করারই উপযুক্ত নন।

পরিশেষে বলতে চাই, আপনার দাম্পত্য জীবন আপনি যেমন চাবেন তেমনই হবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, প্রতিদিন সকালে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আপনার সঙ্গীর প্রেমে পড়া পুরোপুরি সম্ভব। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন 'সবকিছু যতই ভালো হোক, নেতিবাচক কিছু না কিছু তো থাকবেই'। আপনার এই অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাবে বলব, 'আপনাকে যদি গোলাপ আর আবর্জনার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে কোনটিকে বেছে নেবেন?'

কোন স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখবেন সে ব্যাপারে আগে যা বলেছিলাম সেটা মনে আছে? আমরা যে স্মৃতিগুলো মনে রাখতে চাই সেগুলোই আমাদের হৃদয়ে বসতি গড়ে নেয়। আমার নিজের দাম্পত্য জীবনে অন্তত কোনো নেতিবাচক কিছু নেই। আল্লাহ ﷻ জানেন, আমি সত্য বলছি।

মানুষের জীবনে ভালোমন্দ সব ধরনের স্মৃতিই থাকে। আপনি ভালোটা ধরে রেখে সুখে থাকতে চান, নাকি খারাপটা মনে রেখে দুঃখ পেতে চান সেটা সম্পূর্ণই আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

বিয়ের খুতবা

যাবতীয় প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহর জন্য। শান্তি ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর।

“হে মানবজাতি! তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে; এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন; আর এদের দুজন থেকেই অগণিত পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করে পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো; তাঁর নামেই তোমরা একে অপরের কাছে (অধিকার) দাবি করে থাকো। আত্মীয়স্বজনদের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। আল্লাহ সবসময় তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।” [সূরা আন-নিসা, ৪:১]

সুপ্রিয় সুধী, আজ আমরা এক বিয়ের অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছি। নবদম্পতিদের পরস্পরের দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে তোলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি সুন্নাহ। এই খুতবার মাধ্যমে আমি সেটাই করার চেষ্টা করছি।

আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে বলেছেন যে, তিনি সব পুরুষ ও নারীদের একই মাতা-পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কিত সব ব্যাপারে, আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে, কর্মের প্রতিফলের ব্যাপারে এবং এ জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে ইসলাম নারী-পুরুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করে। তবে পার্থক্য হচ্ছে তাদের দায়িত্বের প্রকৃতিতে। ঘরের বাইরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে পুরুষদের উপর, আর ঘরবাড়িকে সুন্দর সুখের নীড় করে গড়ে তোলা ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারীদের উপর। আল্লাহ ﷻ সার্বিক বিবেচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পুরুষদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব দিয়েছেন এবং এ-ও বলে দিয়েছেন যে, সে ব্যাপারে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলার জন্য আল্লাহ ﷻ তাদের

বিশেষ কিছু যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, পুরুষদের এই সার্বিক কর্তৃত্ব দান করার কারণ হলো, স্ত্রীদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এই দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

"পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; কারণ আল্লাহ ﷻ তাদের একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) ব্যয় করে থাকে। এজন্যই ন্যায়নিষ্ঠ নারীরা আন্তরিকভাবে অনুগত হয়। স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হেফাযত করতে বলেছেন তা হেফাযত করে।"

[সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪]

এখানে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ ﷻ পুরুষকে বোঝাতে *'যুকুর'* শব্দটি ব্যবহার করেননি; বরং *'রিজাল'* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি এমন একটি সম্মানসূচক শব্দ যেটি লিঙ্গের দিকে নয় বরং মানুষের চরিত্র, মহত্ত্ব, সম্মান, বীরত্ব এবং মহান উদারতার দিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মনটা অনেক বড়, যারা অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, অন্যের ভালোমন্দের ব্যাপারে যারা চিন্তা করেন, যারা সাহসী, জ্ঞানী— *'রিজাল'* সেসব পুরুষদের বোঝায়। *'রিজাল'* শব্দটি পৌরুষত্বের সর্বোচ্চ অর্থে পুরুষ, স্রেফ প্যান্ট পরিধানকারী অর্থে পুরুষ নয়। এ ধরনের পুরুষেরা আসলেই সম্মানের যোগ্য, কোনো হেয় করার পাত্র নন; এরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

বিয়ের এ পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ ন্যায়নিষ্ঠ নারীগণ প্রথমত আল্লাহর, এরপর তাদের স্বামীদের প্রতি গভীরভাবে অনুগত থাকেন। আমি এখানে রাজনৈতিকভাবে সঠিক হওয়ার জন্য শব্দ নিয়ে খেলছি না। ধার্মিক নারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এ পৃথিবীর সর্বোত্তম নিয়ামত হলো পূণ্যবতী স্ত্রী', যে নারী তার স্বামীর প্রতি আনুগত্যশীল। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা ফাঁদে পড়ে 'আনুগত্য'কে 'আধিপত্য' দিয়ে বদলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রভুসুলভ নারীর চেয়ে অসুন্দর আর কিছুই নেই। এ পর্যায়ে আমাদের জানা দরকার ধার্মিক ও অনুগত নারীর ব্যাপারটি কী? তাদের এই ধার্মিক বা অনুগত হওয়ার প্রতিফলই-বা কী?

আবদুর-রাহম#ন ইব্ন আওফ رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« যখন একজন নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, রামাদ#নে সি়য়#ম রাখেন, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলেন এবং স্বামীর অনুগত থাকেন—তখন তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করুন। » [মুসনাদ আহ়মাদ, হ়াদীস় নং-১৬৬৪, স়াহীহ়]

এখন সিদ্ধান্ত আপনাদের।

বিবাহ এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে পুরুষ এবং নারী আল্লাহকে সাক্ষী মেনে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয় এবং তাঁরই নামে তারা একে অন্যের কাছে তাদের অধিকার দাবি করে থাকে। যেহেতু তারা আল্লাহরই নামে নিজেদের অধিকার দাবি করে এবং তিনি সবসময় তাদের সবকিছু দেখছেন, তাই এ অধিকারগুলো আদায় করার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ ﷻ তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

একটি সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। যে সমাজে শক্তিশালী পারিবারিক মূল্যবোধ এবং মজবুত পারিবারিক বন্ধন বিদ্যমান, সে সমাজই হচ্ছে সুস্থ ও আদর্শ সমাজ। অপরদিকে যে সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল ও ভঙ্গুর, সে সমাজ হতাশা থেকে শুরু করে অপরাধ ও মাদকাসক্তি পর্যন্ত সবধরনের মানসিক অসুস্থতা দ্বারা জর্জরিত হতে বাধ্য। এজন্যই ইসলাম মজবুত পারিবারিক বন্ধনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। আর একারণে রক্তের বন্ধন আছে এমন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামে সরাসরি নিষিদ্ধ।

ইব্‌ন 'আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« একে অন্যকে ভালোবাসে এমন দুজনের জন্য বিয়ের মতো উত্তম আর কিছু আমি দেখি না। » [ইব্‌ন মাজাহ, অধ্যায়: বিয়ে, হ়াদীস় নং-১৮৪৭]

যখন এটি ইসলামি শারী'আহ অনুযায়ী করা হয় তখন ভালোবাসার এ সম্পর্কটিই ইবাদাতে পরিণত হয়। ইসলাম হালালকে সহজ করেছে আর হারামকে করেছে কঠিন। আর এজন্যই বিয়ে এতটা সহজ, সরল এবং বাহুল্য ব্যয় থেকে মুক্ত। কিন্তু আজ আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে হালালকে ব্যয়বহুল, জটিল এবং কঠিন করে ফেলা হয়েছে, আর হারামকে করা হয়েছে সহজলভ্য—ফ্রি। মূল্যবোধের এই বিকৃতির কুফল আপনারা নিশ্চয়ই সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন।

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালো আচরণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'সবচেয়ে ভালো মানুষ কে?' তিনি বলেন, 'যার স্ত্রী তাকে ভালো বলে।'

দাম্পত্য জীবনে এমন কিছু ব্যাপার থেকেই যাবে যা বাহ্যত স্বামী-স্ত্রী যেকোনো একজনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যায়। এগুলোকে মেনে নিয়েই জীবন যাপন করতে হবে। সবকিছু মিলিয়ে ভালো দম্পতি তো তারাই যাদের সংসারটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় না। দাম্পত্য জীবনে আপনি কখনো জিততে পারবেন না। কী করে পারবেন, নিজের বিরুদ্ধে কি নিজে জেতা যায়? এটা অনেকটা নিজের নাক কেটে নিজের মুখকে বিকৃত করা। আপনি হারলে তো হারলেনই, জিতলেও হারলেন।

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> « একজন মু'মিন পুরুষের কখনোই উচিত নয় একজন মু'মিন নারীকে অবজ্ঞা করা। যদি সে ঐ নারীর চরিত্রের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু খুঁজে পায়, তাহলে তার মধ্যে পছন্দনীয় অনেক বিষয়ও খুঁজে পাবে। » [সাহীহ্ মুসলিম, হাদীষ নং-৩৪৬৯]

একটি সফল দাম্পত্য জীবনের দুটি শর্ত রয়েছে: পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ এবং খারাপ স্মৃতি ভুলে যাওয়া।

স্মরণ করুন, আল্লাহ ﷻ কৃতজ্ঞতাবোধের ব্যাপারে কী বলেছেন। তিনি কৃতজ্ঞদের জন্য তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, আর অকৃতজ্ঞদের সতর্ক করে দিয়েছেন তাঁর শাস্তির ব্যাপারে। আল্লাহ ﷻ—যিনি সবার মনের খবর জানেন—তিনি নিজে যদি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সতর্ক করে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের জীবনসঙ্গী—যারা আমাদের অন্তরে কী আছে তার কিছুই জানে না—তার ব্যাপারটা কেমন হওয়া উচিত? তাই নিজের জীবনসঙ্গীকে প্রায়ই ধন্যবাদ দিন, দিনে কয়েকবার করে দিন। অকাতরে ধন্যবাদ দিন, কৃপণতা করবেন না। বিরক্তি ও অনীহা ভাব নিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া আসলে ধন্যবাদ দেওয়া নয়। আর আপনি যদি মনে করেন, আপনার সঙ্গী আচমকা ধন্যবাদ শুনে প্রচণ্ড অভিঘাতে মারা যাবে, তবুও দিন; অন্তত খুশী মনে তাকে মরতে তো দিন!

খারাপ স্মৃতি ভুলে যাওয়ার বিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। সফল বৈবাহিক সম্পর্কের রহস্য হচ্ছে বেছে বেছে কেবল ভালো স্মৃতিগুলো মনে রাখা আর খারাপ বিষয়গুলো ভুলে যাওয়া। খুবই যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাপার। আপনি কেনই বা যেচে আবর্জনা সংগ্রহ করতে চাইবেন? অবশ্য কিছু মানুষ আছে পেশাদার আবর্জনা সংগ্রহকারী। যখনই খারাপ কিছু ঘটে, তারা দিন-তারিখ ধরে ময়লার স্তূপের মতো বাজে স্মৃতিগুলো সামনে নিয়ে আসে। এটা মস্তিষ্ক-কোষের অপচয় ছাড়া আর কিছু না। এগুলো অসুস্থ বৈবাহিক সম্পর্কের লক্ষণ। এসব আবর্জনা পুঁতে ফেলুন। মস্তিষ্ক-কোষগুলো ভরিয়ে ফেলুন সুন্দর স্মৃতির সুরভি দিয়ে।

মিকদাম ইব্‌ন মা'দি ﵁ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« আপনারা নিজেরা যা খান সেটা আপনাদের জন্য সাদাকাহ; আপনাদের শিশুদের, স্ত্রীদের ও কাজের লোকদের যা খাওয়ান সেটাও আপনাদের জন্য সাদাকাহ। » [মুসনাদ আহমাদ, হ়াদীস় নং-১৬৭২৭, স়াহীহ়]

আপনার সঙ্গীকে সুন্দর স্মৃতি উপহার দিন। বৈচিত্র্যময় উপহার দিয়ে চমকে দিন। উপহার দামি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে হলেও মন্দ হয় না।

কী দিলেন সেটা মুখ্য নয়, কীভাবে দিলেন সেটাই মূল কথা। কাজেই সৃজনশীল হোন। ভাবুন, কীভাবে আপনার সঙ্গীকে খুশি করা যায়। বাড়তি সুবিধা হিসেবে উপহার দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার সঙ্গীকে খুব ভালোভাবে জানতে পারবেন। সবচেয়ে ভালো, সুলভ কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী স্মৃতি হচ্ছে লম্বা আলিঙ্গন ও চুম্বন। আপনি আজ কয়বার আপনার স্ত্রীকে চুমু খেয়েছেন? যদি না করে থাকেন, তাহলে কীসে আপনাকে বাধা দিচ্ছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের চুমু খেতেন এবং আলিঙ্গন করতেন। তিনি ﷺ বলেছেন, 'নিজের স্ত্রীদের কাছে ভালো হও; আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'

জীবনসঙ্গী বাবা-মা'র মতো হলে চলবে না, হতে হবে বন্ধুর মতো: সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহযোগী। আজকাল অনেক বিয়ে এ কারণেই নষ্ট হচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের যেকোনো একজন তার সঙ্গীর দোষত্রুটি নিয়ে তাদের বাবা-মা'র কাছে ছুটে যান। অবস্থা এমন হয় যে, অবশেষে তারা তালাকের জন্য কোর্টের দুয়ারে পৌঁছে যান। দেখুন, আপনি যদি বিয়ে করার জন্য যথেষ্ট পরিপক্ব হয়ে থাকেন,

তাহলে আপনি নিজের সমস্যা সমাধানেও যথেষ্ট পরিপক্ক। আর বাবা-মাদের বলছি, আপনাদের সন্তানরা যদি বিয়ের উপযোগী হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তারা আর শিশু নেই। অতএব তাদের উপর অহেতুক কর্তৃত্ব খাটানো বন্ধ করুন। তারা যদি আপনাদের কাছে অভিযোগ নিয়ে আসে, তাহলে তাদের ফেরত পাঠান। দেখবেন, একসময় তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে নেবে। এতে আপনারাও ভালো থাকবেন, তারাও সুখে থাকবে। সমর্থন দেওয়া আর নাক গলানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। দয়া করে দুটোকে গুলিয়ে ফেলবেন না। নিজেদের সংসারের দিকে নজর দিন আর সন্তানদের সংসার থেকে দূরে থাকুন।

সবশেষে মনে রাখুন, সবকিছুর শুরু আর শেষ আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে। কাজেই, এমনভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন। যেকোনো ভালো কাজে একে অপরকে সহায়তা করুন। এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকুন যেগুলো আল্লাহকে ﷻ অসন্তুষ্ট করে। বলা হয়, যেসব দম্পতি একসাথে সালাত আদায় করে, তারা দীর্ঘদিন একসাথে থাকে। কাজেই একসাথে সালাত আদায় করুন। একে অন্যকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে তুলুন। একে অন্যের কুরআন তিলাওয়াত শুনুন। দীন শিখুন একসাথে। একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করুন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে।

যেসব দম্পতি একসাথে আনন্দ উপভোগ করে, তারা দীর্ঘদিন একসাথে থাকে। কাজেই আনন্দ করুন একসাথে। দুজনে মিলে কিছুটা হাসি-তামাশা করুন। সঙ্গীর প্রতি নয়, তাকে সাথে নিয়ে হাসুন। তার সম্মান আপনারই সম্মান। সেটাকে হাস্যরসের নামে কখনো নষ্ট হতে দেবেন না। আসলে এটাতে রসিকতার কিছুই নেই। সব সমালোচনা হবে একান্তে, প্রশংসা হবে সবার সামনে। এভাবেই বেড়ে উঠবে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা। আর তখন—একদা প্রেমে পড়িয়াছিলাম—এমন নয়, জীবনসঙ্গীর প্রেমে পড়বেন বারবার।

ইসলামে বিয়ে হচ্ছে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধন। এ বন্ধন একতা ও ভালোবাসার বন্ধন। এ বন্ধন শ্রদ্ধা ও মায়া-মমতার বন্ধন। সেই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এ পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, যিনি আমাদের সকল চিন্তা, ইচ্ছা ও কাজকর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আর এটাই বিয়েকে পরিণত করে একটি আন্তরিক ইবাদাতে, যে ইবাদাতের জন্য আল্লাহ ﷻ দম্পতিদের পুরস্কৃত

করবেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে সব দম্পতির মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করছি। প্রতিটি দম্পতির জীবনকে যেন তিনি তাঁর দয়া ও রহমতে পরিপূর্ণ করে দেন। তাদেরকে ইসলামের পতাকাবাহী করে দেন। যেদিন আমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াব, সেদিন তিনি যেন আমাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আমাদের সবার জন্য আমি এই দু'আ করি। আমীন!

পাঠক প্রতিক্রিয়া

বইটা যখন কিনেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল বইটার মূল্য অনেক বেশি; কিন্তু পড়ার পর মনে হয়েছে বইটা আসলে "অমূল্য"। আমাদের আধুনিক পারিবারিক জীবনটিকে কীভাবে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাজানো যায়, তারই এক বাস্তবসম্মত "নকশা" প্রদান করা হয়েছে এ বইটিতে। বিবাহযোগ্য ও বিবাহিত, উভয়ের জন্য অবশ্যপাঠ্য একটি বই "বিয়ে: স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর"। বইটিতে এমন কিছু মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে স্বামী-স্ত্রীকে তাদের সমাজে "আদর্শ ইসলামিক দম্পতি" হিসাবে পরিচিতি করে তুলবে। ধর্মীয় আচারনিষ্ঠা, সততা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং পারস্পরিক সহযোগিতাসহ বেশ কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে, যেগুলোর কার্যকর প্রয়োগ হতে পারে একটি পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধির মূলসূত্র। মুসলিম দম্পতির জান্নাতে যাবার পাথেয় হতে পারে এই সহজবোধ্য বইটি। বিয়ের জন্য বর/কনে নির্বাচন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একজোড়া মুসলিম দম্পতির করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে। এক কথায় বলা যায়, বইটি হলো "আধুনিক দাম্পত্য জীবনের গাইডলাইন"।

আশেকুর রহমান
সহকারী পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
চট্টগ্রাম

বইটা পড়ে রীতিমতো প্রেমে পড়ে গিয়েছি... এত্ত ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসগুলো এত্ত সুন্দরভাবে উপমা দিয়ে সুন্দর ভাষাশৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। দাম্পত্য জীবনে কাজে লাগানোর মতো অনেক টিপ্স আছে। ...বইটা এতই পছন্দ হয়েছে যে ফ্রেন্ডের বিয়েতে গিফ্ট করেছি! আমার মতে সবারই অন্তত একবার পড়া উচিত বইটি।

সুরাইয়া সুমি
রংপুর মেডিক্যাল কলেজ

এক কথায় বলতে গেলে মির্জা ইয়াওয়ার বেগ-এর "বিয়ে: স্বপ্ন থেকে অষ্টপ্রহর" বইটি অসাধারণ। বইটি বিবাহিতদের জন্য তো বটেই, অবিবাহিতদের জন্যও সমানভাবে ফলপ্রসু হবে বলেই মনে করি। মির্জা ইয়াওয়ার বেগ-এর সুদীর্ঘ কাউন্সেলিং জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে রচিত বইটি অনেক স্বামী-স্ত্রীর ক্ষয়িষ্ণু সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সহায়ক হবে ইনশ#'আল্ল#হ্। বইটির

ভূমিকায় লেখকের লেখা একটি বাক্য দিয়ে শেষ করছি, "দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তি কেবল স্বামী-স্ত্রীর মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণের উপরই নির্ভর করে। তারা যদি সত্যিই সুখী হতে চায় তাহলে কেউ তা রোধ করতে পারবে না; আর তারা যদি অশান্তি সৃষ্টি করে তাহলে কেউই তাদের শান্তি এনে দিতে পারবে না।"

মুহাম্মাদ মারুফ
চুয়েট
পুরকৌশল বিভাগ, চতুর্থ বর্ষ

সমসাময়িক সমাজে বিয়ের জন্যে পরিবার থেকে যেসব যোগ্যতা খোঁজে, তা হলো: ১. অর্থ ও ব্যাংক ব্যালেন্স, ২. সৌন্দর্য, ৩.পেশাগত যোগ্যত এবং ৪. বংশ মর্যাদা। সবই দুনিয়াবি জীবনের কল্যাণের জন্যে। তাছাড়া বিয়ের ধরন, মন-মানসিকতা অনেক কিছুতেই আমরা মুসলিম আদর্শ থেকে বিচ্যুত। এ ধরনের বই অনেক লোককে একটু হলেও ভাবতে বাধ্য করবে। "সিয়ান" ও মির্জা বেগ সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

মুহাম্মাদ তাহমিদ ইসলাম
ছাত্র, শাবিপ্রবি

বইটা কিনেছিলাম, খুব ভালো লাগল পড়ে। আল্লাহর রহমতে অনেক কিছু জানা হলো, বোঝা হলো।

—রাবেয়া হক স্বর্ণা

...ভাষার আধুনিকতা বিবর্জিত অনুবাদ, শ্রীহীন ডিজাইন আর পেজ—ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামি বই পড়ার ক্ষেত্রে আমার কাছে নিরুৎসাহব্যঞ্জক!

"সিয়ান পাবলিকেশন" আশা করি এক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করতে পারবে ইনশা'আল্লাহ...যারা এই ভালো উদ্যোগটির পেছনে মেধা, শ্রম, সময় দিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য দোয়া রইল।

—শায়খুল আবরার, চট্টগ্রাম

বই নিয়ে আমাদের বাঙালি পাঠক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমাদের সংস্কৃতিতে বই দেওয়া-নেওয়া জিনিসটা আদতে সুন্দর হলেও পাবলিশারদের জন্য ইকনমিক্যাল না। আল-হামদু লিল্লাহ এত কিছু সত্ত্বেও SEAN Publication খুব সুন্দর কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সমকালীন লেখকদের লেখা আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য।

—আবু নাসীহা, মালয়েশিয়া

যারা ফিৎনা থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলতে চাচ্ছেন এবং বিয়ে কেন দিচ্ছে না—এ নিয়ে আফসোস করছেন, তাদের বলব: দেরি না করে এই বইটা চট করে পরে ফেলতে...

আর পড়ার পর একটু নিরিবিলি বসে নিজেকে প্রশ্ন করতে "আমি কি আসলে তৈরি? বিয়ে করে ফিৎনা থেকে না-হয় বাঁচলাম কিন্তু সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য কি আমি তৈরি হয়েছি?

...বিবাহিত-অবিবাহিত সবার পড়ার জন্য চমৎকার একটা বই। বইটা পড়ে আসলেই মনে হচ্ছে 'স্বপ্ন'-এর দুনিয়া থেকে অষ্টপ্রহরে নেমে এসেছি।

—শাহরিন শাফি